স্বস্তিকা

দাম : পাঁচ টাকা
৯ মে, ২০১১, ২৫ বৈশাখ - ১৪১৮
৬৩ বর্ষ, ৩৪ সংখ্যা

পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন : জয় হোক গণতন্ত্রের

জৈয়িতপুর : কি এক নতুন এনরণ?

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ❑ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ❑ ৬-৭

লাদেন নিয়ে পাকিস্তানকে জবাবদিহি করতে হবে ❑ ৮

এবারের নির্বাচনে কয়েকজন মন্ত্রীর পরাজয়ের সম্ভাবনা ❑ ৯

দলীয় জয়-পরাজয় নয়, জয় হোক গণতন্ত্রের ❑
মেঃ জেঃ কে কে গঙ্গোপাধ্যায় (অঃ প্রাঃ) ❑ ১১

জৈয়িতপুর — পারমাণবিক শক্তি পরীক্ষার কি এক নতুন এনরণ? ❑
জয় দুবাসী ❑ ১৩

ভোটের বাজারে ছিটমহল সমস্যা ❑ সাধনকুমার পাল ❑ ১৪

ঘরেরও নয়, পরেরও নয় : মাঝখানে থাকার যমযন্ত্রণা ❑ অর্ণব নাগ ❑ ১৬

শ্রদ্ধাঞ্জলি : সত্য সাইবাবা সমাহিত ❑ ১৯

স্থিতিশীল সরকারের সম্ভাবনা কম অসমে ❑ ২০

ব্যথা নিরাময়ে হু'র প্রশংসা পেল কেরল ❑ ২১

কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেসের স্পেকুলেশন ❑ অমলেশ মিশ্র ❑ ২৩

রামকৃষ্ণ কেল্লায় ঝড়ের পূর্বাভাষ ❑ অর্ণব নাগ ❑ ২৪

মহাবলীপুরম্ : ইতিহাস এখানে ফিরে ফিরে আসে ❑ ২৫

বীরাঙ্গনা প্রীতিলতা ❑ ইন্দিরা রায় ❑ ২৭

জনগণনার প্রাথমিক রিপোর্টেও কংগ্রেসী রাজনীতির ছায়া ❑ এন সি দে ❑ ২৯

'কোরাপসান' এখন 'ইরাপসান' হয়ে সিং-সোনিয়া সরকারের গায়ে ফুটে বের হচ্ছে ❑
শিবাজী গুপ্ত ❑ ৩০

নিয়মিত বিভাগ

এইসময় : ১০ ❑ **অন্যরকম : ১৮** ❑ **চিঠিপত্র : ২২** ❑
সমাবেশ সমাচার : ২৮ ❑ **খেলা : ৩১** ❑ **শব্দরূপ : ৩২** ❑ **চিত্রকথা : ৩৩**

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

ভোটের বাজারে ছিটমহল সমস্যা — ১৪

সম্পাদকীয়

সত্যের জয়

প্রবাদে রহিয়াছে শত কৌশল অবলম্বন করা হইলেও সত্যকে চিরকাল চাপা দিয়া রাখা যায় না। সত্য একদিন না একদিন উদ্‌ঘাটিত হইয়াই থাকে। এযাবৎকাল ধরিয়া প্রচার করিয়া আসা হইয়াছে—গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মুসলমানদের প্রধান শত্রু, তিনি ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার কলঙ্ক, হিন্দুত্বের ধ্বজাধারী প্রবল সাম্প্রদায়িক, তাঁহার রাজত্বে মুসলমানরা আর নিরাপদ নহে ইত্যাদি নিন্দাসূচক বাক্য। গুজরাতের দাঙ্গা লইয়া তাঁহাকে কম হায়রান করা হয় নাই, অপদস্থ করিবার চক্রান্ত এখনও চলিতেছে। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গ্রামে গুজরাত দাঙ্গার নকল সি ডি তৈরি করিয়া এবং তাহা মানুষকে দেখাইয়া বিজেপি বর্বর মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক ইত্যাদি গল্প শোনানো শুধু সিপিআইএম দলই করে নাই, বিহারে লালুপ্রসাদ যাদব করিয়াছে, উত্তর প্রদেশে মুলায়ম মায়াবতী এবং সমগ্র দেশে কংগ্রেসদল একই কাণ্ড করিয়াছে। সেইজন্যই গোধরা কাণ্ড নয়, মুম্বাই বিস্ফোরণ কাণ্ডও নয়, গুজরাত দাঙ্গা লইয়া এখনও চর্চা চলিতেছে। মুসলিম ভোট আদায়ের জন্য ভবিষ্যতেও তাহা চলিবে। আজ এতদিন পরে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং কলকাতায় এক নির্বাচনী জনসভায় বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের অপেক্ষা গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মুসলিমদের অনেক বেশি চাকরি দিয়াছেন, বেশি সুযোগ সুবিধা দিতেছেন এবং সেই রাজ্যে মুসলিমরা অনেক নিরাপদ। রাজনীতিকরা ভোটের প্রচারে অনেক সত্যমিথ্যা বক্তব্য রাখিয়া থাকেন। কিন্তু যখন দেশের প্রধানমন্ত্রী কোনও বক্তব্য রাখিয়া থাকেন তখন তাহার সত্যতা লইয়া সন্দেহের অবকাশ থাকার কথা নয়। আসলে গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষকেও দেশের প্রতি আস্থাভাজন নাগরিক হিসেবে দেখিয়া থাকেন। 'মুসলমান' হিসেবে নয়। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রজাপালনের নিরপেক্ষ কর্তব্য পালন করিতেছেন তিনি। দেশের উপর হামলাকারী শত্রুকে নিকেশ করিতে যেমন তাঁহার হাত কাঁপে না, তেমনি জাতীয়তাবাদী মুসলিমদের উন্নয়নেও তিনি সদা সতর্ক। তাঁহার কাছে মুসলমানরা ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে স্বীকৃত নয়। গুজরাতে দাঙ্গার পরে যে আনসারউদ্দিন পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিয়াছিল সে কিন্তু পুনরায় গুজরাতেই ফিরিয়া গিয়াছে। কারণ পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং শাসকদলসহ রাজনৈতিক দলগুলি তাহাকে লইয়া রাজনৈতিক ফায়দা তুলিতেই ব্যস্ত ছিল। তাহার কর্মসংস্থান এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করে নাই। ভোট প্রচারে ব্যবহার করিয়াছিল, কিন্তু প্রতিদান দেয় নাই। বস্তুত সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছেই মুসলিম সম্প্রদায় ভোট আদায়ের যন্ত্র মাত্র। এইজন্য কোনও দল মুসলমানদের মূল্যবোধ সম্পন্ন শিক্ষিত মানুষ হিসেবে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন নাই। মুসলমানদের উন্নয়ন হইলে, মুসলমান সম্প্রদায় শিক্ষিত হইলে, জাতীয়তাবাদী মনোভাব সম্পন্ন হইলে কংগ্রেস মুলায়ম লালুপ্রসাদ মায়াবতীর দল লাটে উঠিবে। মুসলমান সম্প্রদায় কুসংস্কার সম্পন্ন, অশিক্ষিত অর্থাৎ দেশবিরোধী থাকিয়া গেলেই এই দলগুলির রাজনৈতিক লাভ। তাই যে কোনও নির্বাচনের পূর্বে গুজরাত দাঙ্গা লইয়া নরেন্দ্র মোদী বিজেপির বিরুদ্ধে বাপান্ত চলিয়া থাকে। মিডিয়ার তৎপরতা বাড়ে এবং রাজনৈতিক নেতাদের চোখের জল পর্ব চলিতে থাকে, কিন্তু ভোটপর্ব মিটিলেই সব উধাও হইয়া যায়। তিস্তা শীতলাবাদ, অরুন্ধতী রায়ের মতো ব্যক্তিদের এনজিওগুলি কেবল মানবাধিকারের নামে মুসলিমদের জন্য সারাবছর চোখের জল ফেলিয়াই রাশি রাশি অর্থ উপার্জন করিয়া থাকে। এই উপার্জনের আশায় অসততার আশ্রয় লইতেও কখনও কখনও তাহারা পিছপা হয় না। যেমন বেস্ট বেকারি মামলায় প্রধান সাক্ষীকে মিথ্যা বলিতে বাধ্য করিয়াছেন তিস্তা। এতসবের পরেও দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলনে বিখ্যাত গান্ধীবাদী নেতা আন্না হাজারেও গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে অনুসরণের আহ্বান জানাইয়াছেন। কলকাতায় নির্বাচনী প্রচারে আসিয়া প্রধানমন্ত্রী সত্য কথাটিই আসলে বলিয়া ফেলিয়াছেন। শেষপর্যন্ত সত্যের জয় হইবেই। ভারত আত্মার মূল বাণীও তাই—'সত্যমেব জয়তে'।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

কিন্তু একথা আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, আমাদের দেশে সমাজ সকলের বড়। অন্যদেশে 'নেশন' নানা বিপ্লবে'র মধ্যে আত্মরক্ষা করিয়া জয়ী হইয়াছে—আমাদের দেশে তদপেক্ষা দীর্ঘকাল সমাজ নিজেকে সকলপ্রকার সংকটের মধ্যে রক্ষা করিয়াছে। আমরা কয় হাজার বৎসরের বিপ্লবে, উৎপীড়ন, পরাধীনতায়, অধঃপতনের শেষ সীমায় তলাইয়া যাই নাই। এখনও যে আমাদের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে সাধুতা ও ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে মনুষ্যত্বের উপকরণ রহিয়াছে, আমাদের আহারে সংযম এবং ব্যবহারে শীলতা প্রকাশ পাইতেছে, এখনও যে আমরা পদে পদে ত্যাগ স্বীকার করিতেছি, বহু দুঃখের ধনকে সকলের সঙ্গে ভাগ করিয়া ভোগ করাই শ্রেয় বলিয়া জানিতেছি; সাহেবের বেহারা সাত টাকা বেতনের তিন টাকা পেটে খাইয়া চার টাকা বাড়ি পাঠাইতেছে, পনেরো টাকা বেতনের মুহুরী নিজে আধমরা হইয়া ছোট ভাইকে কলেজে পড়াইতেছে—সে কেবল আমাদের প্রাচীন সমাজের জোরে। এ সমাজ আমাদিগকে সুখকে বড় বলিয়া জানায় নাই—সকল কথাতেই, সকল কাজেই, সকল সম্পর্কেই, কেবল কল্যাণ, কেবল পুণ্য এবং ধর্মের মন্ত্র কানে দিয়াছে। সেই সমাজকেই আমাদের সর্বোচ্চ আশ্রয় বলিয়া তাহার প্রতিই আমাদের বিশেষ দৃষ্টিক্ষেপ করা আবশ্যক।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ভারতবর্ষীয় সমাজ)

কালিয়াগঞ্জে মন্দিরে গো-মাংস ফেলে অস্থিরতা সৃষ্টির চেষ্টা

সংবাদদাতা॥ গত ২৪ এপ্রিল উত্তর দিনাজপুর জেলার হেমতাবাদ ব্লকের মহিপুর গ্রামে কালিয়াগঞ্জ—রায়গঞ্জ হাইরোড সংলগ্ন বুড়ী বাসলীদেবীর মন্দিরে সদ্য কাটা দাঁতসহ গোমাংস পড়ে থাকতে দেখা যায়। মন্দিরের সেবাইত কমল দেবশর্মা বিষয়টি জানতে পেরে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের কাছে যান। তারা দেখছি, দেখব করে বিষয়টিকে অবহেলা করে। এরপর ওইদিনই বেলা ২টা নাগাদ স্থানীয় গ্রামবাসীরা এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে কালিয়াগঞ্জ-রায়গঞ্জ হাইরোড অবরোধ করে। বিকালে হেমতাবাদ থানা থেকে পুলিশ আসে। পুলিশের আশ্বাসে পথ অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। পুলিশ সেই গো-মাংস নিজেদের কব্জায় নিয়ে নেয়। ইতিমধ্যে কালিয়াগঞ্জে স্থানীয় যুবকেরা ঘটনাস্থলে পৌঁছালে পুলিশ প্রশাসন সজাগ হয়। জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায়, ওই গ্রামেরই সফির মহম্মদ (পিতা প্রয়াত খোকা মহম্মদ)-এর প্ররোচনায় কয়েকটি ছেলে এই জঘন্য ঘটনাটি ঘটিয়েছে। এরপর স্থানীয় গ্রামবাসী ও যুবকেরা মিলে প্রায় ৬০-৭০ জন একসঙ্গে হেমতাবাদ থানায় যায়। গ্রামবাসীদের স্বাক্ষরসহ একটি গণআবেদন জমা দেওয়া হয়। মন্দিরের সেবাইত কমল দেবশর্মা, সফির মহম্মদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অনুযায়ী পুলিশ প্রশাসন কেস-নম্বরও দিয়ে দেয়। কেস নম্বরটি হলো—৩৭/১১(২৪/৪/২০১১) কিন্তু আজ পর্যন্ত পুলিশ দোষীকে গ্রেফতার করতে পারেনি। উপরন্তু স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা কমল দেবশর্মা, স্বপন বিশ্বাসকে সবসময় হুমকি দিচ্ছে, আবার কখনও বা আপোষ মীমাংসা করার জন্য প্রলোভন দেখাচ্ছে। এই ঘটনায় রাজনৈতিক নেতাদের আসল মুখ সাধারণ মানুষ বুঝতে পারছে। উল্লেখ্য, দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে গ্রামের যুবক সম্প্রদায় এব্যাপারে রুখে দাঁড়িয়েছে। তারা দোষীর শাস্তি চায়। এখন প্রশাসন কি করে তাই দেখার।

অন্য আর একটি ঘটনায় কালিয়াগঞ্জের পাহাড়গাঁ গ্রামে কিছু মুসলিম যুবক হিন্দু মেয়েদের কটূক্তি করায়, তার প্রতিবাদ করতে গেলে ভবেশ চন্দ্র রায়কে মুসলমান যুবকরা বেধড়ক মারধর করে। স্থানীয় যুবকরা এই ঘটনায় কালিয়াগঞ্জ থানায় অভিযোগ জানায়। ২৪ এপ্রিল রাতে কালিয়াগঞ্জ থানায় বোঝাপড়া-বৈঠকে মুসলমান যুবকরা নিজেদের দোষ স্বীকার করে ক্ষমা চায়। ভবিষ্যতে এইরকম কিছু করবে না বলে জানায় এবং ভবেশ চন্দ্র রায়ের চিকিৎসার খরচ দিতেও রাজী হয়।

সরকারি মদতেই গোমাংস ব্যবসায়ীদের রমরমা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর প্রদেশ—দেশের এই দুই বড় রাজ্যে গো-হত্যা নিষিদ্ধ আইন থাকলেও এখানেই সব থেকে বেশী গো-হত্যা হয়ে থাকে। উত্তর প্রদেশে গোহত্যা নিষিদ্ধ আইন ১৯৫৫ (২০০১ খৃঃ সংশোধিত) থাকা সত্ত্বেও সরকারি উদাসীনতা এবং প্রশাসনিক আধিকারিকদের প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ সহযোগিতায় গোমাংস ব্যবসা ক্রমশই ফুলেফেঁপে উঠছে।

সাধারণ মানুষের অভিযোগ, পুলিশই এইসব গোমাংস ব্যবসায়ীদের আড়াল করছে। কেননা রাজ্যের ক্ষমতাসীন বহুজন সমাজ পার্টির সঙ্গে এইসব গোমাংস ব্যবসায়ীদের ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। গত ২৭ এপ্রিল মীরাটের দৈনিক 'জনবাণী' এই অসাধু জোটের কথা ফাঁস করে দিয়েছে। গোমাংস ব্যবসায়ীরা সরকারি পশু চিকিৎসা আধিকারিদের কাছ থেকে 'মোষের মাংস' হিসেবে প্রমাণপত্র লিখিয়ে নিয়ে গোরুর মাংস পাচার করছে। উল্লেখ্য, সড়ক পথে গোমাংস নিয়ে যেতে হলে উত্তরপ্রদেশে এই প্রমাণপত্র আবশ্যিক। এই প্রমাণপত্রে স্পষ্টই লেখা থাকে—এই মাংস অন্য প্রজাতির সুস্থ পশুর (গরুর নয়) এবং সেই অনুযায়ী পশুর কাটা মাংস প্যাক করা হয়েছে। জনবাণী-র সংবাদে লেখা হয়েছে—মুজফফরনগরের জেলার মুখ্য পশু আধিকারিক ডাঃ বিক্রম সিংহ বর্মার হস্তাক্ষর ও সীলমোহর যুক্ত একটি প্যাকেটের প্রমাণপত্রে 'মহিষের মাংস' লেখা হয়েছে। যদিও এই প্রমাণপত্রের সাহায্যে গোমাংসই পাচার করা হচ্ছিল। অভিযোগ হলো, ডাঃ সিংহ নিজের আখের গুছোতে এরকম জাল প্রমাণপত্র দিয়ে থাকেন।

এই বেআইনী কাজের বিরুদ্ধে মীরাটের বিজেপি শাখা আমরণ অনশন শুরু করলে প্রশাসন নড়েচড়ে বসে। পরে প্রশাসনের পক্ষে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে আশ্বস্ত করা হলে অনশন প্রত্যাহার করা হয়।

উত্তর-পূর্বের পর এবার দক্ষিণ ভারত

ধর্মান্তরকরণ করে দেশভাগই লক্ষ্য চার্চের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ '৪৭-এর পরিস্থিতি আবারও। দেশভাগের কালো ছায়া ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণ নতুন পরিস্থিতিতে আবারও গ্রাস করে ফেলেছে বলে আশঙ্কা প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের। সেবার ছিল মুসলিমরা, এবার খৃস্টানরা। সম্প্রতি রাজীব মালহোত্রা এবং অরবিন্দন নীলেকানন্দ তাঁদের সদ্য প্রকাশিত 'ব্রেকিং ইন্ডিয়া ঃ ওয়েস্টার্ন ইন্টারভেনশনস ইন দ্রাভিদিয়ান অ্যান্ড দলিত ফল্টলাইনস' গ্রন্থে প্রোটেস্ট্যান্টপন্থীদের বহু যুগ আগেই ভারত-ভাগের বিস্তারিত পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করার পাশাপাশি পশ্চিমী দুনিয়া থেকে আসা কু-চক্রী ধর্মপ্রচারকদের সম্পর্কেও সতর্ক করা হয়েছে। পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণা করে বইটিতে দেখানো হয়েছে, পরিকল্পনামাফিক উত্তর-পূর্ব ভারতকে খৃস্টান অধ্যুষিত রাজ্যে পরিণত করার পর তাদের পরবর্তী লক্ষ্য দক্ষিণ ভারতে ঘাঁটি গাড়া; বিশেষ করে তামিলনাড়ুতে, সম্পূর্ণ অবৈধ উপায়ে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ রাজনৈতিক মদতে চার্চের পক্ষ থেকে একটি বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার করা হচ্ছে যে, তামিলরা একটি আলাদা জাতি এবং সেখানকার একটি অতি জনপ্রিয় হিন্দু-সংস্কৃতি, শৈব সিদ্ধান্তম, আদতে 'খৃস্টানিটি'রই প্রাথমিক রূপ। প্রসঙ্গত, ভারতবর্ষে বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে 'জাতিদ্বন্দ্ব'কে উস্কে দিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতা তৈরি করতে চার্চ উনিশ শতক থেকেই সক্রিয়। বিশপ রবার্ট ক্ল্যাডওয়েল (১৮১৪-১৮৯১)-এর আমলে পৃথক 'দ্রাবিড় জাতি'র তত্ত্ব সর্বপ্রথম প্রচার করে চার্চ। বিশপ দাবী করেন, দ্রাবিড়রাই দক্ষিণ ভারতের প্রকৃত (অরিজিনাল) বাসিন্দা এবং তারা আর্য ব্রাহ্মণদের দ্বারা প্রতারিত (চীটেড) হয়েছেন। গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে, ধর্মান্তরকরণের চেয়েও মারাত্মক হচ্ছে দক্ষিণ ভারতের মূলত জনজাতি এলাকায় অবৈধ অর্থের (পড়ুন ডলার) আমদানি। সেখানকার অর্থের কাছে বিক্রি হয়ে যাওয়া কয়েকজন শিক্ষাবিদ, প্রোটেস্ট্যান্টপন্থী এবং যে সমস্ত বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত রয়েছে তাদের এক এবং একমাত্র লক্ষ্য হিসাবে 'ব্রেকিং ইন্ডিয়া' গ্রন্থে সম্পূর্ণ দক্ষিণ ভারতকে খৃস্টান রাজ্যে পর্যবসিত করার আশঙ্কাই প্রকাশ পেয়েছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন একটু আলাদা ও সমস্ত স্তরে এর প্রতিরোধ এখনই না গড়ে তুললে অচিরেই দেশভাগের সম্ভাবনা দেখা দেবে। আর এসবের সঙ্গে অনিবার্যভাবেই জড়িয়ে গেছে কমিউনিস্টদের নাম। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কমিউনিস্ট ছাত্ররা তামিলনাড়ু, চম্পালক্ষ্মীতে রয়েছেন তাঁরা বই প্রকাশ করে রটাচ্ছেন, তামিলনাড়ু সবসময়ই সেকুলার (পড়ুন অ-হিন্দু) রাজ্য। মোট কথা, '৪৭-এর দেশভাগের প্রাক্কালে কমিউনিস্টদের যে জঘন্য, লজ্জাজনক ভূমিকা ছিল, আজও তার ব্যত্যয় হচ্ছে না। এম দেইভানিয়াগম বলে জনৈক ব্যক্তি চার্চের প্রত্যক্ষ মদতে একটি বই লিখেছেন, যেখানে হিন্দু স্তোত্র-র খৃস্টান মানে করা হয়েছে। এবং চার্চের একটি 'অ্যাকাডেমিক বডি' সেই অনুবাদকে স্বীকৃতিও দিয়েছে। প্রসঙ্গত, ইন্টারন্যাশানাল ইনস্টিটিউট অব তামিল স্টাডিজে তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এবং মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে 'খৃস্টান স্টাডিজ চেয়ার' তৈরি করার পেছনে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, দক্ষিণ ভারতে যাঁরা খৃস্টানিটিকে 'প্রমোট' করতে চাইছে, তাদের 'প্রমোট' করতে চেষ্টা করছে কমিউনিস্টরা। কারণ কমিউনিস্টদের পাশে না পেলে, এম দেইভানিয়াগমের পক্ষে ওভাবে উচ্চপদে আসীন হওয়াটা এতটা মসৃণ হোত না। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি যা তাতে বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা একদিকে ডলার ছড়িয়ে গরীবদের ধর্মান্তরকরণ ও অন্যদিকে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিকল্পনা মাফিক তামিল-সেন্টিমেন্ট-কে মিথ্যা আবেগের সুড়সুড়ি দিয়ে দেশকে কমিউনিস্ট প্ররোচনায় বিভাজনের পথে ঠেলে দিচ্ছে চার্চ।

চীন সীমান্তের কাছাকাছি বিমান ক্ষেত্রগুলিকে আবার চালু করা হচ্ছে

সংবাদদাতা॥ ভারত সীমান্ত বরাবর চীনা সেনাবাহিনীর তৎপরতায় উদ্বিগ্ন ভারতীয় বিমানবাহিনী এখন আরও খানিকটা এগিয়ে বিমান ওঠানামার ক্ষেত্র (অ্যাডভান্সড ল্যান্ডিং গ্রাউণ্ড—এ এল জি) তৈরিতে নেমে পড়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অরুণাচলে পাসীঘাট, মেচুকা, ওয়ালং, তুতিং, জিরো, বিজয়নগরে অগ্রবর্তী বিমানঘাটি তৈরির কাজ চলছে। সেইসঙ্গে বেশ কয়েকটি স্থানে হেলিপ্যাড গড়ার কাজও এগিয়ে গেছে। ইতিমধ্যেই ভারত-চীন সীমান্তের পশ্চিম ও মধ্যক্ষেত্র বরাবর অগ্রবর্তী বিমানক্ষেত্রগুলিকে আবার নতুন করে চালু করা হয়েছে।

সম্প্রতি তিব্বতে চীন বেশ কয়েকটি বিমানক্ষেত্র তৈরি করেছে যা ভারত সীমান্তের খুব কাছাকাছি। এছাড়া সড়ক পরিকাঠামোও মজবুত করেছে যাতে চীনা সেনাদের যাতায়াত সহজ হয়। ভারত অবশ্য চীনা সেনাদের মোকাবিলায় সীমান্তে সড়ক ও ফাইটার জেড বিমান ওঠানামার পরিকাঠামোকে মজবুত করছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে দুটো নতুন পার্বত্য ডিভিসন বাড়িয়েছে। উত্তরাখণ্ডের ধারাসুতেও বিমানক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। চীন সীমান্তের কাছাকাছি উত্তরকাশীতে ২৯৫০ ফুট উচ্চতায় বিমান ওঠানামার অগ্রবর্তী ঘাঁটি (এ এল জি) তৈরি করা হয়েছে। ২০১০-এর শেষদিকে বেশী হইচই না করে ভারতীয় বিমান বাহিনীর এ এন-৩২ এয়ারক্রাফট ওঠানামা করেছে। বিমানবাহিনীর প্রধান কার্যালয়ের ত্রৈমাসিক নিউজ বুলেটিন 'দি ব্লু গ্লোরি'-র সাম্প্রতিক সংখ্যায় এই মর্মে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। জম্মু কাশ্মীরের তিনটি এলাকার সন্ধিস্থল দৌলত বেগ ওলডি, পাক অধিকৃত কাশ্মীর এবং আকসাই চীন, ১৯৬২-তে চীন-ভারত যুদ্ধের পর চীন দখলীকৃত পূর্ব লাদাখের ৩৮,০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা-র কাছাকাছি এই প্রথম এমন অগ্রবর্তী বিমান ঘাঁটি চালু হলো। প্রাকৃতিক কারণে যখন সড়ক পথ বিচ্ছিন্ন থাকবে, তখন অগ্রবর্তী এইসব বিমান ঘাঁটিগুলিই সাধারণ নাগরিকদের যাতায়াত ও পণ্যসামগ্রী চলাচলের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হবে। লাদাখের প্রত্যন্ত উত্তর অংশে ১৬,২০০ ফুট উঁচুতে এবং নিয়ন্ত্রণরেখা থেকে মাত্র ৯ কিলোমিটার দূরত্বে, ২০০৮-এর ৩১ মে এবং নিয়ন্ত্রণরেখা থেকে মাত্র ২৩ কিলোমিটার দূরে লাদাখের দক্ষিণতম প্রান্ত নয়োমা-তে বিমানবাহিনীর হেলিকপ্টার বেস হিসেবে ২০০৯-এর সেপ্টেম্বর ব্যবহৃত হয়েছে।

লাদেন নিয়ে পাকিস্তানকে জবাবদিহি করতে হবে

গূঢ়পুরুষের

কলম

ওসামা বিন লাদেন মৃত। এই ঘোষণাটি সংবাদমাধ্যমে শোনার জন্য সারা বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ গত এক দশক অপেক্ষা করেছেন। বিশ্বের 'মোস্ট ওয়ান্টেড' এই ধর্মান্ধ ইসলামি সন্ত্রাসবাদী নেতা আল্লার নামে অসংখ্য নির্দোষ শান্তিপ্রিয় মানুষকে বলি দিয়েছে। লাদেনের শেষ বিচার অবশেষে হয়েছে। বিশ্ববাসী ভারমুক্ত হয়েছে। তবে এখানেই শেষ নয়। এবার পাকিস্তানকে জবাবদিহি করতে হবে বিশ্ববাসীর কাছে। জানাতে হবে কীভাবে লাদেন এবং তার সঙ্গী জেহাদিরা ইসলামাবাদের মাত্র ৬০ কিলোমিটারের মধ্যে একটি বৃহৎ প্রাসাদে এতকাল বহাল তবিয়তে বাস করছিল। কোনও সন্দেহ নেই যে পাক গোয়েন্দা সংস্থা আই এস আইয়ের প্রত্যক্ষ মদতেই এই গোপন বাস সম্ভব হয়েছিল লাদেন ও আল কায়দার জঙ্গিদের। পাকিস্তানের রাষ্ট্র নায়করাও জানতেন যে ওসামা কোথায় আছে। জানতেন বলেই বিভ্রান্ত করেছিলেন মিথ্যা সংবাদ প্রচার করে যে ওসামা বিন লাদেন আফগানিস্তান—পাকিস্তান সীমান্তে দুর্গম পার্বত্য এলাকায় আত্মগোপন করেছে। এই মিথ্যা সংবাদের ভিত্তিতেই মার্কিন সেনা বিমান থেকে আফগান সীমান্তে নিয়মিত বোমা বর্ষণ করা হয়েছে। হতাহত হয়েছেন অসংখ্য নিরপরাধ আফগান গ্রামবাসী। এই মিথ্যা সংবাদ প্রচার করে আফগানিস্তানে মানুষ মারার জন্য এবার পাকিস্তানের রাষ্ট্রনায়কদের বিশ্ব জনতার আদালতে অভিযুক্ত হতে হবে। শুধু ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ সালে নিউ ইয়র্কে বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রের দুটি আকাশ ছোঁয়া বহুতল ধ্বংস করার অপরাধের জন্যই নয়।

লাদেন তার সশস্ত্র মুজাহিদ্দিনদের নিয়ে প্রকাশ্যে ইসলামাবাদের কাছেই জনবসতি এলাকায় প্রায় এক দশক বাস করছিল। পাক গোয়েন্দারা জানতো না এমন কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। আবার বলছি, পাকিস্তানকে এর জবাবদিহি করতেই হবে। নতুবা পাকিস্তানকে সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র হিসাবে চিহ্নিত করতে হবে।

প্রায় তিন হাজার মার্কিন নাগরিককে হত্যার জন্যই নয়। শুধু লাদেনের বিচার নয়, বিচার করতে হবে তার মদতদাতাদের। বিশ্ব আদালতে বিচার চাইতে হবে লাদেনের আশ্রয়দাতাদেরও। বিগত ১০ বছর ওসামা বিন লাদেনের মতো একজন নৃশংস খুনিকে আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্রনায়কদেরও বিচার হবে না কেন বিশ্ববাসীকে জানাতে হবে।

পাকিস্তানের রাষ্ট্রনায়করা জানতেন ওসামা তার সঙ্গীসাথীদের নিয়ে বহাল তবিয়তে পাক রাজধানী ইসলামাবাদের ৬০ কিলোমিটার উত্তরে আবতাবাদে একটি রাজপ্রাসাদে বাস করছে। তাঁরা জানতেন, আই এস আই ওসামাকে পূর্ণ নিরাপত্তা দিচ্ছে। তাই মার্কিন কম্যান্ডোরা পাক প্রশাসনকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখেই গোপনে আবতাবাদে লাদেনের প্রাসাদে ঝটিকা হানা দেয়। জানা গেছে, মোট চারটি সামরিক হেলিকপ্টারে চড়ে কম্যান্ডোরা রাতের অন্ধকারে পাকিস্তানের বিলাল এলাকায় আবতাবাদে লাদেনের প্রাসাদে আকাশ থেকে হামলা চালায়। প্রাসাদ থেকে লাদেনের সশস্ত্র দেহরক্ষীরা পাল্টা গুলি চালালে মার্কিন সেনাদের একটি হেলিকপ্টার ধ্বংসও হয়। অর্থাৎ, লাদেন সেখানে ছদ্মবেশে বাস করছিল এমনটা নয়। লাদেনকে রক্ষার জন্য তার বিশ্বস্ত তালিবানি মুজাহিদ্দিনরা চব্বিশ ঘণ্টা পাহারায় ছিল। মার্কিন কম্যান্ডোদের হামলার প্রতিরোধে লাদেনের সশস্ত্র দেহরক্ষীরা রকেট লঞ্চার থেকে সর্বাধুনিক মেশিনগান সবই ব্যবহার করেছে। এই সশস্ত্র রক্ষীরা একটি প্রাসাদ পাহারা দিচ্ছে এত বছর ধরে অথচ পাকিস্তানের পুলিশ, প্রশাসন, সামরিক গোয়েন্দারা কেউ কিছুই জানতে পারেনি এমন আজব কথা কেউ শুনেছেন কি? পাকিস্তানের মাটিতে ওসামা বিন লাদেনকে পাওয়া গেছে। এরপরেও কেন পাকিস্তানকে সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করা হবে না তার জবাব দিতে হবে মার্কিন প্রশাসনকেও।

মুম্বাইতে পাক সন্ত্রাসবাদী হামলার পর ভারতের পক্ষ থেকে তথ্যসহ একটি তালিকা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীকে দেওয়া হয়। এই তালিকায় মুম্বাই হামলার সঙ্গে যুক্ত সন্ত্রাসবাদীদের মূল পাণ্ডাদের নাম ও ঘাঁটির সন্ধান দেওয়া হয়। পাক কর্তৃপক্ষ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে এদের ধরা হবে এবং বিচার হবে। সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা হয়নি। উল্টে পাকিস্তান সমঝোতা এক্সপ্রেসে বোমা বিস্ফোরণ কাণ্ডে অভিযুক্ত ভারতীয়দের পাকিস্তানের হাতে তুলে দেওয়ার দাবি জানিয়েছে। বুঝতে অসুবিধা নেই যে মুম্বাই হামলার মাথাদের আড়াল করতেই এমন অযৌক্তিক দাবি তোলা হয়েছে।

সোজা সাপটা বলছি, পাকিস্তানের মাটিতে বিশ্বের নৃশংসতম সন্ত্রাসবাদী ঘাতক ওসামা বিন লাদেন তার সৈন্যসামন্ত নিয়ে কীভাবে এত বছর ঘাঁটি গেড়ে বসেছিল তার জবাবদিহি বিশ্বের দরবারে পাকিস্তানকে করতেই হবে। পাক-আফগান সীমান্তে পাহাড়-জঙ্গলে ঘেরা দুর্ভেদ্য গুহায় লাদেন বাস করলে এমন কথা বলতাম না। বাস্তবে লাদেন তার সশস্ত্র মুজাহিদ্দিনদের নিয়ে প্রকাশ্যে ইসলামাবাদের কাছেই জনবসতি এলাকায় প্রায় এক দশক বাস করছিল। পাক গোয়েন্দারা জানতো না এমন কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। আবার বলছি, পাকিস্তানকে জবাবদিহি করতেই হবে। নতুবা পাকিস্তানকে সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র হিসাবে চিহ্নিত করতে হবে।

এবারের নির্বাচনে কয়েকজন মন্ত্রীর পরাজয়ের সম্ভাবনা

নিশাকর সোম

এরাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের তৃতীয় দফা শেষ হলো। মোট ১৭৯ কেন্দ্রে নির্বাচন শেষ হলো। তৃণমূলনেত্রী দাবি করেছেন তাঁদের জোট (?) ১৭০টি কেন্দ্রে জিতবেন। সিপিএম-এর রাজ্য নেতৃত্ব বারংবার বলে চলেছেন, অষ্টম বামফ্রন্ট সরকার হবেই। যদিও তা জনসাধারণের মধ্যে প্রতিভাত হচ্ছে না। তৃতীয় দফার নির্বাচনে অর্থাৎ

কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগণা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণা—এই তিনটি জেলাতে কয়েকজন মন্ত্রীর পরাজয়ের সম্ভাবনা আছে। এই তিনটি জেলার মধ্যে বিজেপি-কেও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা যাবে না। তৃতীয় পর্বের নির্বাচনে দুটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র—যাদবপুর এবং দমদম। যেখানে প্রার্থী হলেন—মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং বহু বিতর্কিত গৌতম দেব। বুদ্ধদেববাবুর পক্ষে শেষদিকে একটু বেশি সমর্থন দেখা গেল। এদিকে দমদমে গৌতম ও ব্রাত্য লড়াই কশমাকষ। তবে দমদমে গৌতম দেব হারলে—উত্তর ২৪ পরগনা জেলা কমিটির নেতৃত্বের বিসর্জন আসন্ন হবে। বন্দর এবং মেটিয়াবুরুজ (গার্ডেনরিচ) কেন্দ্রে বর্তমান বিধায়ক যাদের তৃণমূলের চাপে কংগ্রেস মনোনয়ন দেয়নি, এই দুই প্রার্থীর কাজকর্ম এলাকার মানুষের মধ্যে প্রভাব ফেলেছে। ফলে এদের ভোট পাওয়া, এমনকী জেতার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। উল্লেখ করা প্রয়োজন, রাম পেয়ারী রাম-এর সংগঠনও আছে।

এছাড়া জোড়াসাঁকো কেন্দ্রে স্মিতা বকসী, জানকী সিং এবং বিজেপি প্রার্থী তথা কলকাতা পুরসভার প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র মীনা পুরোহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এর মধ্যে স্মিতা বক্সীর বিরুদ্ধে স্থানীয় কিছু টি এম সি-কংগ্রেসকর্মীর ক্ষোভ আছে। জানকী সিং এলাকায় অপরিচিত। এদিক থেকে দেখলে মীনা পুরোহিত এগিয়ে আছেন।

কাশীপুর-বেলঘরিয়া-তে যে ক্ষত রাজদেও গোয়ালা-দুলাল ব্যানার্জি অ্যান্ড কোং সৃষ্টি করে দিয়ে গেছেন, সেই ক্ষত এখনও নিরাময় হয়নি। যা তৃণমূল প্রার্থী বর্তমান বিধায়ক মালা সাহার গলায় জয়ের মালা পরাতে সাহায্য করবে। জয় হোক-রাজদেও অ্যান্ড কোং-এর! কলকাতায় শ্যামপুকুর কেন্দ্রে তৃণমূলের বর্তমান বিধায়ক তারক দাস ব্যানার্জি-র দাঁড়ানোর ইচ্ছা ছিল। তিনি পুনমনোনয়ন থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। ফলে তাঁর প্রভাবশালী অংশ তৃণমূলের নতুন প্রার্থীর বিরুদ্ধেই যাবে। অতুল্য ঘোষের নাতি মনোনয়ন থেকে বঞ্চিত তৃণমূল নেতা অতীন ঘোষও কি চুপ করে থাকবেন?

সল্টলেক কেন্দ্রে প্রয়াত মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর জয়ের ধারা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছিল। তারই পরিণতিতে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পত্নী রমলা চক্রবর্তীর বিপুল ভোটে পরাজয়। এই কেন্দ্রে সুভাষ-তনয়কে প্রার্থী করার ব্যাপারে এক অংশের চেষ্টা ছিল। কিন্তু সুভাষ-তনয় এলাকায় অতীতের কোনও রাজনৈতিক কাজে অংশ নেননি—এই যুক্তিতে 'সিপিএম-এর রাজ্য-নেতৃত্ব তাঁকে প্রার্থী করেননি।

মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রার্থী বনাম ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থীর লড়াই উত্তর ২৪ পরগণায় উল্লেখযোগ্য। যেমন, বীজপুরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মুকুল রায়ের পুত্রের কেন্দ্র। এখানে সিপিএম বারবার কাঁচড়াপাড়াতে শাসানির কথা নির্বাচনী কর্তাদের জানালেও তাতে কোনও ফল হয়নি। এ সবই সিপিএম আগের কর্মের ফল। পুলিশ প্রশাসনের বিশেষ করে কলকাতা পুলিশের বড় অংশ সিপিএম-এর বিরুদ্ধে চলে গেছে।

মজার কথা হলো, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম নিয়ে বামফ্রন্টের ফরওয়ার্ড ব্লক এবং আর এস পি নেতাদের বক্তৃতা আজ বিরোধী প্রার্থীরাই উদ্ধৃতি দিয়ে ব্যবহার করছেন। ভোট শান্তিতে হলেও ভোটের পর অশান্তি হবেই। ভোটের কথা বাদ দিয়ে ইতিমধ্যে সিপিএম-এর মধ্যে একটি বিতর্ক উঠেছে। বিষয় হলো— পাঁচটি রাজ্যের নির্বাচনী ফলাফলের পর সংসদে ইউপিএ সরকারের বিরুদ্ধে যদি বিজেপি অনাস্থা প্রস্তাব আনে, তবে সেটা বামপন্থীদের সমর্থন করা উচিত। কারণ, ধারণা হচ্ছে—পাঁচটি রাজ্যেই কংগ্রেস এবং তার উপদলের উপর যথেষ্ট ধাক্কা পড়বে। এই কারণেই অনাস্থা প্রস্তাব-এর পটভূমি তৈরি হবেই।

এছাড়া ১৯৯৫-এ পুরুলিয়া অস্ত্র বর্ষণ নিয়ে বামপন্থীরা সংসদে সরব হবে। তার উপর বিধানসভা নির্বাচনগুলি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রান্নার গ্যাস প্রভৃতির মূল্যবৃদ্ধি হবেই। শত প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও পোশাক-এর উপর করের বোঝা কমার সুযোগ নেই।

এইসবের ফলে বিরোধী দলগুলির পরবর্তী নির্বাচনে সুবিধা হবে।

এই সময়

রামদেবের পত্র

ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে অনশন সত্যাগ্রহ শুরু করতে চলেছেন যোগগুরু বাবা রামদেব। দিল্লীতে আগামী ৪ জুন স্বয়ং বাবা রামদেব এই অনশন সত্যাগ্রহ শুরু করবেন। এই আন্দোলনে সারাদেশের ১০ কোটি লোক যোগ দেবে বলে তিনি আশা করছেন। ভ্রষ্টাচার বিরোধী আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য তিনি সকল রাজনৈতিক দলের কাছেও চিঠি লিখবেন। ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত লোকপাল বিল এবং বিদেশের ব্যাঙ্কগুলিতে জমিয়ে রাখা কালো টাকা-কে ভারতীয় সম্পত্তি হিসাবে ঘোষণার জন্য আইন প্রণয়ণের বিষয়ে তার কিছু প্রস্তাব ওই চিঠিতে তিনি লিখেছেন। পেজাওয়ার স্বামী বিশ্বেশতীর্থ-এর ৮১তম জন্মোৎসব উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এই কথা জানিয়েছেন। রাজনৈতিক দলগুলির কাছে তাঁর আহ্বান—ভ্রষ্টাচারীদের যাতে কঠোরতম শাস্তি দেওয়া যায় এমন ভাবেই লোকপাল বিলটি আইনে পরিণত করতে হবে। সেইসঙ্গে বিদেশের ব্যাঙ্কগুলিতে যে ৩০০ লক্ষ কোটি কালো টাকা গচ্ছিত রাখা হয়েছে তা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হিসাবে ঘোষণা করার জন্য আইন প্রণয়নেরও দাবী জানিয়েছেন তিনি।

ডোগরা সার্টিফিকেট প্রত্যাহার

জম্মুর জন্য প্রযোজ্য 'ডোগরা সার্টিফিকেট' আদেশটি ওমর আবদুল্লা সরকার প্রত্যাহার করে নেওয়ায় বিজেপি তীব্র সমালোচনা করেছে। ন্যাশনাল কনফারেন্স পরিচালিত সরকারের এই আদেশটির প্রত্যাহার তাদের সাম্প্রদায়িক মানসিকতাকেই উন্মোচিত করে দিয়েছে। উল্লেখ্য, জম্মুর ডোগরা সম্প্রদায়ের মানুষ যাতে সহজে পুলিশ বিভাগের চাকুরিতে যোগ দিতে পারে তার জন্যই এই সার্টিফিকেট-এর আদেশটি জারি করা হয়েছিল। হুরিয়তের মতো বিচ্ছিন্নতাবাদীদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে ওমর সরকার সাম্প্রদায়িক মানসিকতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে বলেই মনে করছেন সাধারণ জম্মুবাসী।

জাল পাসপোর্ট চক্র

আমেরিকার ওয়াশিংটন ভিসিতে ভারতীয় দূতাবাসে জাল পাসপোর্ট চক্র সক্রিয় রয়েছে বলে দিল্লী পুলিশের অনুমান। দিল্লীর ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর শাখার পুলিশ সম্প্রতি ওয়াশিংটনের ভারতীয় দূতাবাস থেকে ইস্যু করা ১৯টি পাসপোর্ট জাল সন্দেহে আটক করেছে। গোয়েন্দারা পরে তদন্ত করতে গিয়ে জেনেছেন, মানুষ-পাচারের বিভিন্ন কাজে ওই পাসপোর্টগুলো ব্যবহৃত হোত। আন্তর্জাতিক মুসলিম দুনিয়ার সঙ্গে এর যোগসাজশ থাকতে পারে বলেই আশঙ্কা তাদের।

বাঘ বাঁচাতে

জীবন বিজ্ঞানের পরিভাষায় 'বিপন্ন প্রজাতি' বাঘের জীবন রক্ষায় অভিনব উদ্যোগ নিল রাজস্থানের বন-দপ্তর। সেখানকার সরিস্কা টাইগার রিজার্ভে ব্যক্তিগত সমস্ত যান-বাহনের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যদিও রাজস্থান সরকারের এই উদ্যোগ নতুন কিছু নয়। কারণ ইতিপূর্বেই রণথম্ভোর ন্যাশনাল পার্কে একইভাবে সমস্ত ব্যক্তিগত যানবাহন প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। সরিস্কায় বাঘের পায়ের ছাপ পাওয়া যাচ্ছিল না বলে ব্যাঘ্র-গণনার সময়েই শোরগোল উঠেছিল। ব্যাপারটা প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর অবধিও গড়ায়। তার পরিপ্রেক্ষিতেই প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর ও রাজস্থান সরকারের ঘুম ভেঙেছে কিনা সে প্রশ্নও উঠছে। তবে ওয়াকিবহাল মহলের মতে, যতই যা খুশি করুক সরকার, চোরাশিকার বন্ধে কঠোর না হলে বাঘ বাঁচানো মুশকিল।

দলাই লামার প্রত্যাবর্তন

ভারতে আশ্রয় নেওয়া দলাই লামার তিব্বতে প্রত্যাবর্তনের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করাই তাঁর আশু কর্তব্য বলে মনে করেন তিব্বতের সদ্য-নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী লবসাং সাঙ্গে। আজ থেকে ৫০ বছর আগে চীনের অত্যাচারে পোটালা প্যালেস ছেড়ে এদেশের অরুণাচলে আশ্রয় নেন দলাই লামা। বৌদ্ধদের মধ্যে দলাই লামার প্রভাব খর্ব করতে 'পাঞ্চেন লামা' সৃষ্টি করেছিল চীন। কিন্তু তিব্বতবাসী চীনের দুরভিসন্ধি ধরে ফেলায় পাঞ্চেন তেমন জনপ্রিয় হয়নি। তিব্বতের মানুষের কাছে 'দলাই লামা' আজও শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিকতা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। চীন যদিও তিব্বতীয় 'প্রধানমন্ত্রী'কে অসাংবিধানিক বলে মনে করে, কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে তিব্বত চীনা অক্টোপাসের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে স্বায়ত্তশাসনের অধিকারী হতে চায়। লবসাং সাঙ্গের 'প্রধানমন্ত্রী' পদে নির্বাচন এবং নির্বাচনের অব্যবহিত পরে দলাই লামার প্রত্যাবর্তনের দাবী যে চীনকে রাজনৈতিকভাবে বিপদে ফেলবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

বিটি বেগুনে না

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাপ্রুভ্যাল কমিটির বিশেষজ্ঞদের বৈঠকের পরদিনই ওড়িশা সরকার জানিয়ে দিল, রাজ্যে কোনওরকম 'জেনেটিক্যালি মডিফায়েড' শস্য যেটা বাণিজ্যিকভাবে চাষ হবে তা ঢুকতে দেওয়া হবে না। স্বাভাবিকভাবেই এতে 'বিটি বেগুন'সহ অন্যান্য এজাতীয় কিছু ফসলের নাম রয়েছে। রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী ডঃ দামোদর রাউত জানিয়েছেন, 'বিটি বেগুন আখেরে ক্ষতি করবে রাজ্যের মাঝারি ও প্রান্তিক চাষীদের। ওড়িশার বহু বৈচিত্র্যসম্পন্ন ঐতিহ্যশালী বেগুন বীজ রয়েছে। আসলে বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে সুকৌশলে রাজ্যে ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা হয়েছে।' সবকটি রাজ্যই যেভাবে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে যাচ্ছে বিটি বেগুন নিয়ে, তাতে আগামীদিনে কেন্দ্র সরকারের ফ্যাসাদ আরও বাড়বে বলেই তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অনুমান।

পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন - ২০১১

দলীয় জয়-পরাজয় নয়, জয় হোক গণতন্ত্রের

মেঃ জেঃ কে. কে. গঙ্গোপাধ্যায় (অঃ প্রাঃ)

মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরেই চারটি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। অন্য যে কোনও রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন অনেকটা আলাদা। কারণ এই রাজ্যে শুধুমাত্র দলমতের বিচারই নয়, নির্বাচন আয়োগের পক্ষেও এক চূড়ান্ত পরীক্ষা। নির্বাচনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই নির্বাচনকে কলুষিত করার প্রয়াস এ রাজ্যে যেমন ভাবে হয়ে চলেছে, অন্য কোনও রাজ্যে কেন বিশ্বের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে হয় বলে মনে হয় না। প্রথমেই ধরা যাক ভোটার তালিকা। এই তালিকায় এত সংখ্যক ভুয়ো ভোটার রয়েছেন, বিদেশী অনুপ্রবেশকারীদের নাম রয়েছে, তাদের বাদ দিলে ভোটার তালিকার প্রায় অর্ধেক নামই বাদ যাবে। আবার নাম বাদ দেওয়াও সহজ নয়। সবার কাছেই ভোটার পরিচিতি কার্ড রয়েছে। কিভাবে বিদেশীরা ভোটার কার্ড পেল, সে প্রশ্ন করা যাবে না। একটা বিদ্যালয়ের ছাত্র ওই ব্যক্তির সঙ্গে এক মিনিট কথা বললেই বলে দেবে, সে বিদেশী অনুপ্রবেশকারী। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে যাঁরা ওই কার্ড দেওয়ার সময় সব বিষয়ে খতিয়ে দেখেন, তাঁরা বুঝতে পারেন না, ব্যক্তিটি বিদেশী অনুপ্রবেশকারী। কারণ তার কাছে জন্ম শংসাপত্র, বিদ্যালয়ের শংসাপত্র, জমির দলিল ইত্যাদি রয়েছে। তাঁরা কি করবেন? এইসব শংসাপত্র দলের কর্তাব্যক্তি, কর্মীরা যোগাড় করে দিয়েছেন! অন্যদিকে হাজার হাজার যোগ্য ভোটারদের নাম তালিকায় স্থান পায়নি। ভোটার তালিকা সংশোধন করা এক দুরূহ ব্যাপার।

এখানেই শেষ নয়। নির্বাচনের দিন পোলিং অফিসার এবং দলীয় এজেন্টরা কি নিরপেক্ষ ভাবে ভোট পরিচালনা করবেন? পোলিং এজেন্টরা এবং পোলিং অফিসাররা বেশিরভাগই শাসকদলের কো-অর্ডিনেশন কমিটির সদস্য। তার উপর আছে বুথ দখলকারী দল। পুলিশকর্মীরাও এই মহাযজ্ঞে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তাঁরাও প্রতি নির্বাচনে প্রশ্ন চিহ্নের মুখে পড়েন।

শহর অঞ্চলে সংবাদ মাধ্যম, টিভি ক্যামেরা সর্বত্র নজর রাখেন। কিন্তু জেলায়, বিভিন্ন গ্রামে অবস্থা সম্পূর্ণ অন্যরকম। শাসক দলের

ভোটার তালিকা কঠোর ভাবে সমীক্ষা করে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের নাম তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে। কে বা কারা তাদের মিথ্যা শংসাপত্র জোগাড়ে করতে সাহায্য করেছেন তাদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তি দিতে হবে। যে সমস্ত সুরক্ষা কর্মী নিরপেক্ষভাবে কর্তব্য পালনে ইচ্ছাকৃতভাবে বিফল প্রতিপন্ন হন, সরকারী কর্মচারীরা নির্বাচনের দায়িত্বে থেকে নির্ভীক ভাবে নিরপেক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব নির্বাহ না করেন, তিনি যতবড় অথবা যে সংগঠনেরই সদস্য থাকুন কঠোর শাস্তি দিতে হবে। যে সমস্ত সমাজে বিরোধী রাজনৈতিক দলের অর্থ ও বদান্যতার সুবাদে সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার অথবা ভীতি প্রদর্শন করবে তাদের যাবজ্জীবন কারাবাসের শাস্তি দিতে হবে।

হার্মাদবাহিনী স্থানীয় পুলিশের সহযোগিতায় বিভীষিকার আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে। অত্যাচার করে বিরোধী-কর্মী নেতাদের গ্রামছাড়া করেছে। অনেক নির্বাচনে বিরোধী পক্ষ প্রার্থী দিতে পারেন না। প্রার্থী দিলেও প্রতি বুথে দলীয় এজেন্ট রাখতে সমর্থ হন না। যখন প্রয়োজন সেইসব এজেন্টদের বুথ থেকে বের করে দিয়ে বিনা বাধায় বোতাম টিপে ভোটপর্ব সম্পন্ন করা হয়। নির্বাচনী পরিদর্শক কোনও বুথে পৌঁছলে এসব কিছুই দেখতে পান না। এছাড়াও ভোটারদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে বাড়ীর মহিলাদের সিঁথির সিঁদুর মুছে দেওয়ার হুমকি, ক্ষেতের ফসলে আগুন দেওয়ার হুমকি নির্বাচনের সময় প্রতিদিনের ঘটনা। এইসব হুমকির কোনও প্রমাণ নির্বাচন আয়োগ কেন, কোনও আদালতেই পেশ করা সম্ভব নয়। থানায় অভিযোগ জানালে, বড়বাবুও বলবেন 'হুমকি দিয়েছে' তার প্রমাণ কি? শাসক দলের হার্মাদরা বলবেন, নির্বাচন পরিদর্শক, কেন্দ্রীয় বাহিনী একদিন চলে যাবে, তখন তোদের বাঁচাবে কে? গণতান্ত্রিক পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে-গঞ্জে অবাধ নির্বাচনের এটাই চিত্র।

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, প্রতিটি নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন আয়োগের কর্মকর্তাদের উপস্থিতি, জেলায় জেলায় বহিরাগত পরিদর্শকদের তৎপরতা, হাজার হাজার আধা সামরিক বাহিনীর টহল নজরদারী। তাই অবাধ, নির্ভীক মতদান না হওয়ার কোনও কারণ থাকতে পারে না। পারে, যদি কেন্দ্রীয় বাহিনীকে প্রতিটি বুথে নিয়োগ না করে থানায় রিজার্ভ ফোর্স হিসাবে বসিয়ে রেখে হোমগার্ড দিয়ে বুথ রক্ষা করার ব্যবস্থা থাকে তাহলে সবই সম্ভব। জেলার পুলিশ সুপার কতটা নিরপেক্ষ তার উপরই নির্ভর করে নির্বাচন কতটা অবাধ ও শান্তিপূর্ণ হবে। নির্বাচন আয়োগের পরিদর্শকদের দোষ দেওয়া উচিত হবে যা। কারণ আফজল আমানুল্লা, কে জে রাও এর মত পরিদর্শক পশ্চিমবঙ্গে অবাধ শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের প্রকৃত চিত্র নির্বাচন আয়োগকে আগের নির্বাচনে দিয়েছিলেন। কিন্তু শোনা যায়, সেইসব রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়নি। ফাইল চাপা রয়ে গিয়েছিল, এবছরের বিধানসভা নির্বাচনের জন্য সেই সব রিপোর্ট পর্যালোচনা করে নির্বাচন আয়োগ বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছেন। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জনিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গে অবাধ, সুষ্ঠু শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা নির্বাচন কমিশনের সামনে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ!

বিশেষ করে একদিকে মাওবাদী সন্ত্রাস কয়েকটি জেলায় স্থানীয় মানুষদের প্রতিদিন মৃতদেহ সৎকার করতে বাধ্য করছে। অন্যদিকে শাসক দলের হার্মাদ বাহিনী নেতাই গ্রামের মতো খুনের ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে। তা সত্ত্বেও নির্বাচন আয়োগ এবং সব রাজনৈতিক দল শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের বিষয়ে আশাবাদী। সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে যাঁরা সমাজের বিদ্বজ্জন নামে পরিচিত তাঁরা পরিবর্তনের পক্ষে প্রবল ঝড় তুলেছেন। কারণ বিগত ৩৫ বছরের এক দলের (ফ্রন্টের) ক্ষমতাসীন সরকার রাজ্যের কোনও ক্ষেত্রেই আশাপ্রদ ফল দেখানো দূরের কথা পশ্চিমবঙ্গকে সর্বক্ষেত্রে ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে উন্নয়নের খতিয়ানে শেষ পংক্তিতে নিয়ে গিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের সমস্যাগুলি মনে হয় অন্য যে কোনও রাজ্যের তুলনায় বহুগুণ বেশি এবং কঠিন। কিন্তু তা সত্ত্বেও যতটুকু উন্নয়ন হওয়া উচিত ছিল তার সিকিভাগও হয়নি। আমাদের স্কুল-কলেজ জীবনে শুনতাম প্রায় প্রত্যেক রাজনৈতিক দল পাঁচ বছর পর ক্ষমতাচ্যুত হয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করতেন, পাঁচ বছর বড় কম সময়। কাজ আরম্ভ করেছি কিন্তু ফল দেখাবার সময় পেলাম না। যদি অন্তত আরও পাঁচটা বছর সময় পেতাম, দেখিয়ে দিতাম, কত কি করতে পেরেছি। কিন্তু নিরবিচ্ছিন্ন ৩৫ বছর রাজত্ব করে বর্তমানের ক্ষমতাসীন দল একটাই অজুহাত দিয়ে এসেছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের ভ্রান্ত নীতির ফলে...। কিন্তু যখন তাঁরা সেই কেন্দ্রীয় সরকারের শরিক ছিলেন, তখনও রাজ্যের জন্য কত প্রকল্প নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন? কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এই পরিবর্তনের ঝড় কেন উঠেছে তারও অনেক কারণ আছে। বলা হয় কৃষিতে আমরা প্রথম, শিল্পে দ্বিতীয়। কিন্তু পঞ্জাব-হরিয়ানার গম না এসে পৌঁছুলে বাঙ্গালী অনাহারী, চাল-ডালে কুলায় না। অন্ধ্রপ্রদেশের মাছ আমদানী না করলে বাঙ্গালীর পাতে মাছ দেখা যাবে না। 'শিল্পে প্রথম হব', কিন্তু সিটু নামক এক বস্তুকে ব্যবহার করে পশ্চিমবঙ্গে হাজার হাজার কলকারখানা বন্ধ হয়ে আগাছার জঙ্গলে ঢাকা পড়ে যাক। একটাই আওয়াজ 'চলবে না, চলবে না', 'ঘেরাও হবে, বন্ধ হবে' ইত্যাদি। ব্যবসায়ী শিল্পপতি লাভ করতে এসেছেন, দান-খয়রাত করতে নয়। অনেক নেতা শিল্প-মালিকের মোটা নজরানা পেয়ে জোর করে ধর্মঘট ইত্যাদি করে হাজার হাজার শ্রমিক পরিবারকে পথে বসিয়েছে। মালিক হাসিমুখে লকআউট ঘোষণা করে কারখানায় তালা ঝোলাবার সুযোগ পেয়েছেন।

২০১১ বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল এবং কংগ্রেস জোট করে ভোটে লড়ছেন, কিন্তু দলের অনেক নেতা টিকিট না পেয়ে নির্দল হয়ে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন। প্রায় সব দলই জানেন মুসলমান সম্প্রদায়ের ভোট এই যুদ্ধে কতটা গুরুত্বপূর্ণ। সেই ভোট ব্যাঙ্ককে সপক্ষে টানবার কোনও প্রয়াসই কেউ বাদ দিচ্ছেন না। নির্বাচন আয়োগ অনেক আগে থেকেই আটঘাট বেঁধে আসরে নেমেছেন। তাঁদের প্রয়াস পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন যেন অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ করা যায়। তা সত্ত্বেও বিভিন্ন অঞ্চলে দলের নেতাকর্মীরা খুন হচ্ছেন। নির্বাচনের দিন যত এগিয়ে আসবে এই মৃতদেহের মিছিল আরও বাড়বার সম্ভাবনা। সব নেতাই দেশসেবা করার জন্যই নির্বাচনে দাঁড়ান, বিশেষ করে গরীব ও পিছিয়েপড়া মানুষের কল্যাণের জন্য। তাহলে এত হত্যা, এত রক্তক্ষরণ কেন? তাহলে ''কিসসা কুর্সিকা'' কথাটাই সত্য, আর সব ভাঁওতা? আন্না হাজারে ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে ফলপ্রসু লোকপাল বিলের জন্য আমরণ অনশন আন্দোলন করেছেন। এমতাবস্থায়, পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে কিভাবে সুষ্ঠু এবং শান্তিপূর্ণ করা সম্ভব? আমার মনে হয়, ভোটার তালিকা কঠোর ভাবে সমীক্ষা করে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের নাম তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে। কে বা কারা তাদের মিথ্যা শংসাপত্র জোগাড় করতে সাহায্য করেছেন তাদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তি দিতে হবে। যে সমস্ত সুরক্ষা কর্মী নিরপেক্ষভাবে কর্তব্য পালনে ইচ্ছাকৃতভাবে বিফল প্রতিপন্ন হন, সরকারী কর্মচারীরা নির্বাচনের দায়িত্বে থেকে নির্ভীক ভাবে নিরপেক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব নির্বাহ না করেন, তিনি যতবড় অথবা যে সংগঠনেরই সদস্য থাকুন কঠোর শাস্তি দিতে হবে। যে সমস্ত সমাজ বিরোধী রাজনৈতিক দলের অর্থ ও বদান্যতার সুবাদে সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার অথবা ভীতি প্রদর্শন করবে তাদের যাবজ্জীবন কারাবাসের শাস্তি দিতে হবে। সুষ্ঠু এবং অবাধ নির্বাচন প্রক্রিয়াই গণতন্ত্রের প্রধান উপাদান। সেই প্রক্রিয়া কলুষিত হলে গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাই পক্ষপাতদুষ্ট হবে। আপামর ভারতবাসীর কাছে সেটা কোনওক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়।

কিন্তু এই কঠোর ব্যবস্থা কিভাবে কার্যকর করা সম্ভব হবে? আমার মনে হয় প্রতিবেশী বাংলাদেশ এই বিষয়ে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, সেটা বিচার্য হতে পারে। অর্থাৎ বাধ্যতামূলক ভাবে প্রতিটি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের অন্তত দুমাস আগে থেকে রাষ্ট্রপতির শাসন জারী করতে হবে। লোকসভা নির্বাচনের আগেও সারা ভারত রাষ্ট্রপতির শাসনে আসবে। অবৈধ অনুপ্রবেশ-কারীদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিলেও তাদের নিজের রাষ্ট্র হয়তো তাদের গ্রহণ করবে না, তাহলে তাদের রাষ্ট্রবিহীন ব্যক্তি ঘোষণা করে, এদেশে কর্মসংস্থানের পারমিট দেওয়া যেতে পারে। রাষ্ট্রের সর্বস্তরে ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে কঠোর এবং সর্বাত্মক যুদ্ধঘোষণা করতেই হবে। আন্না হাজারে বোধহয় সেই উদ্দেশেই দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়েছেন। কে জিতল, কে হারল বড় কথা নয়। ভারতীয় গণতন্ত্রকে জয়যুক্ত করতেই হবে।

জৈয়িতপুর — পারমাণবিক শক্তি পরীক্ষার কি এক নতুন এনরণ ?

অতিথি কলম

জয় দুবাসী

স্বর্গীয় প্রতিশোধ কথাটি উচ্চারণ করেছেন টোকিও শহরের গভর্নর সিনতারো ইশাহারা। বিগত মার্চ ২০০১-র বিধ্বংসী ভূমিকম্প ও তার ফলশ্রুতিতে যে মর্মান্তিক সুনামী জাপানের ওপর আছড়ে পড়ে বিপুল জীবনহানি ও ধ্বংস ডেকে এনেছে সেই পরিপ্রেক্ষিতেই ইশাহারার এমন বিলাপ। পরবর্তীকালে তাঁর এই কিছুটা আবেগহীন প্রতিক্রিয়ার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিলেও, জাপানী জনগণের লাগামহীন লোভ ও অনৈতিক আচার-আচরণকেই তিনি ঈশ্বরের তরফে তাদের এই শাস্তি পাওয়ার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

এই প্রসঙ্গে বলতে হবে আমরা ভারতীয়রা অন্তত সাম্প্রতিক সময়ে জাপানীদের থেকেও অনেক বেশি নীতিহীন হয়ে পড়েছি। ঠিক সেই কারণেই হয়ত ঈশ্বরের আরও কঠিন দণ্ড আমাদের ওপরও নেমে আসবে। অতীতে বরাবরই দেখা গেছে ঈশ্বর রুষ্ট হলে তাঁর দেওয়া শাস্তি সব সময় গরীবের ওপরই বর্ষিত হয়, ঠিক যেমন জাপানের ক্ষেত্রে ঘটেছে। সাম্প্রতিক আণবিক বিপর্যয়ে কম করে ২০,০০০ জাপানী মারা গেছেন, আরও যাচ্ছেন। জাপানীদের প্রতি সমবেদনা জানানোর পাশাপাশি আমার ভাবতে অবাক লাগে, কেন শুধু জাপানীরাই কিছুটা সময়ের ব্যবধানে বারবার ঈশ্বরের এমন নির্দয় আঘাত পাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে একটু ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালীন ও তারপরে চীনের যে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জাপানী আধিপত্যে ছিল তার বন্দী ও জনগণের ওপর জাপানীরা জার্মান নাজীদের থেকেও বীভৎস অত্যাচার চালিয়েছিল। হিরোসিমা-নাগাসাকির যুগপৎ ধ্বংস এরই প্রাপ্য শাস্তি হলেও, গভর্নর ইশাহারার হয়ত সঠিকভাবেই মনে হয়েছে সেটাই পর্যাপ্ত নয় আরও একটু বাকি ছিল।

এখন আমরা আমাদের দেশের– 'জৈয়িতপুরের' দিকে ফিরে যাই মহারাষ্ট্রের যে অঞ্চলে 'ফুকুসিমার' মতনই একটি পারমাণবিক চুল্লি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা চলছে।

এখানে বলা দরকার প্রস্তাবিত প্রকল্পের স্থানটি অতীতের কুখ্যাত এনরণ সংস্থার জন্য নির্দিষ্ট জায়গার প্রায় পাশেই। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ সেই প্রকল্পটি কোনওদিনই বাস্তবায়িত হয়নি আর পরবর্তীকালে বরাতপ্রাপ্ত আমেরিকান কোম্পানীটিও দেউলিয়া ঘোষিত হয়। ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ ক্ষমতায় থাকা বেশকিছু রাজনীতিবিদ ও মহারাষ্ট্রের উপর্যুপরি কয়েকজন মুখ্যমন্ত্রী একটা সময় এই প্রকল্পের জন্য একাধিক ঘুষকাণ্ডে লিপ্ত হন। এনরণ কোম্পানী শুধু দেউলিয়াই হয়নি, তার বহু কর্তা জেলবাসী হন ও অনেকে পরবর্তীকালে আত্মহত্যা করেন।

আমার কেমন যেন একটি গভীর উপলব্ধি হচ্ছে যে এই জৈয়িতপুরেই ইতিহাসের এক করুণ পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে যা মোটেই কাকতালীয় নয়। জৈয়িতপুরের এই প্রকল্প অনেকাংশেই এনরণের 'কার্বন কপি' বলে মনে হয়। এক্ষেত্রে এটি ফ্রান্সের কোম্পানী যার পেছনে দাঁড়িয়েছেন স্বয়ং ফরাসী রাষ্ট্রপতি সারকোজী ঠিক যেমন এনরণকে সরাসরি মদত দিয়েছিল ওয়াশিংটন। সারকোজী নিজে ফ্রান্স থেকে দিল্লী উড়ে এসে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের কাছ থেকে এক প্রকার সম্মতিই আদায় করে নিয়ে যান যে ভারত সরকার এটিকে রূপায়ণ করবেনই। প্রকল্পটির প্রস্তাবিত উৎপাদন ক্ষমতা ৯৯০০ অর্থাৎ প্রায় ১০,০০০ মেগাওয়াট। এটিই হবে পূর্ব গোলার্ধের সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন পারমাণবিক

> **পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্রগুলির ভারতবর্ষে নির্মাণ খরচ পৃথিবীর অন্য যে কোনও জায়গার চেয়ে তিন থেকে চারগুণ বেশি। এগুলি তৈরি হতে যুগ কেটে যায়। সর্বোপরি, শেষমেষ এর দায়িত্ব যে কার ওপর বর্তায় তাও কেউ জানে না।**

চুল্লী যার আনুমানিক খরচ ২০ বিলিয়ন আমেরিকান ডলার। এগুলি সবই মোটামুটি ধরে নেওয়া খরচা কেননা এই শক্তি কেন্দ্র (Power Station) এখনও ডিজাইন স্তরেই পৌছয়নি। কিন্তু ভয়ের কারণ এটাই যে টারবাইনগুলি যে ডিজাইনের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হবে সেই প্রযুক্তি শুধু ভারতে কেন পৃথিবীর কোথাওই আজ অবাধ পরীক্ষিত নয়। এভিভা নামের এই ফরাসী কোম্পানীটি আদতে প্রেসিডেন্ট সারকোজীর এক প্রিয় বন্ধুর। কিন্তু বিস্ময়ের এটাই যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী যিনি জনান্তিকে 'পরিচ্ছন্ন মহাশয়' নামে সমধিক খ্যাত তিনি এমন একটি সুবৃহৎ প্রকল্প যেগুলির অধিকাংশই এনরণ-এর মতো উৎপাদনের আলো দেখে না আর অসৎভাবে অর্থের আদান প্রদান হওয়াই যেখানে দস্তুর তার মধ্যে নিজেকে জড়িত হতে দিচ্ছেন!

মনে রাখা জরুরি যে জৈয়িতপুর প্রকল্পের ডিজাইন বা নক্সা ইতিপূর্বে পৃথিবীর কোনও দেশেই পরীক্ষিত নয়। তাই অনায়াসে বলা যেতে পারে যে এই কেন্দ্র কোনওদিনই বাস্তবায়িত নাও হতে পারে। এ ছাড়া এখন পর্যন্ত এটাও জানা যায়নি যে এমন বৃহৎ প্রকল্পের টাকা কে দেবে। ফরাসী সরকার কি এর ব্যয়ভার বহন করবে? সবচেয়ে আশঙ্কার বিষয় প্রেসিডেন্ট সারকোজী চলে গেলে এই প্রকল্প পরিত্যক্ত হবে না ত! কেননা সারকোজীর পরবর্তী নির্বাচনে বিদায় সম্ভাবনা প্রবল। তাহলে ভারতবর্ষ এমন একটা অপরীক্ষিত প্রকল্পের মধ্যে মাথা গলাচ্ছে কেন? উত্তর ভারতবর্ষে পারমাণবিক শক্তির ব্যাপারটা বরাবরই গোপনীয়তার বর্মে ঢাকা। কেউই জানতে পারে না ক্ষমতার অলিন্দে তার পাশের ঘরে কি হচ্ছে। পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্রগুলির ভারতবর্ষে নির্মাণ খরচ পৃথিবীর অন্য যে কোনও জায়গার চেয়ে তিন থেকে চারগুণ বেশি। এগুলি তৈরি হতে যুগ কেটে যায়। সর্বোপরি, শেষমেষ এর দায়িত্ব যে কার ওপর বর্তায় তাও কেউ জানে না। এখন পর্যন্ত দেশের যা রিঅ্যাক্টর আছে সেগুলি HWR (Heavy Water Reactors) কিন্তু প্রস্তাবিত জৈয়িতপুরে হবে ই পি আর ধরনের রিঅ্যাক্টর যার সম্বন্ধে আমাদের বিজ্ঞানীদের বাস্তবিক কোন ধারণাই নেই। এই ধরনের ৭/৮টি চুল্লি (রিঅ্যাক্টর) হবার কথা যার একটি হতেই সব ঠিকঠাক চললে ১০ বছর লাগবে।

এই প্রসঙ্গে দেশে কেলেঙ্কারীতে কুখ্যাত হওয়া কে ভি টমাস-এর কথা বলেই লেখা শেষ করব। সরকার যেমন জানপ্রাণ দিয়ে টমাসকে আগলে রেখেছিল ঠিক সেই দলবলই জৈয়িতপুর প্রকল্পে ফরাসী কোম্পানীটির পাশে দাঁড়িয়ে আছে। এটি এমন একটি কোম্পানী যাদের ভারতবর্ষে কাজ করার কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই, ঠিক যেমন কুখ্যাত এনরণ-এরও ছিল না। অথচ এটা ধরে নেওয়ার কোনই কারণ নেই যে এইসব বিপুল অর্থবাহী চুক্তি করা ও সম্পাদনের ক্ষেত্রে ফরাসী কোম্পানীগুলি বা তাদের সরকারী প্রশাসন অত্যন্ত নীতিনিষ্ঠ ও সততার প্রতীক। এনরণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার সময় যে বিপুল বেআইনী অর্থের লেনদেন হয়েছিল ঠিক সেই ভাবেই যে এই ক্ষেত্রেও পুনরাবৃত্তি হবে এমনটা ভাবাই যায়। এনরণ-এর সময় জায়গাটির নাম ছিল ডাভোল, আজকের ফরাসী কোম্পানীটির নাম Areva আর জায়গাটির নাম জৈয়িতপুর। আসুন আমরা জৈয়িতপুরের নিয়তি নির্দিষ্ট মানুষগুলির জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাই যেমন আমরা সুনামী বিধ্বস্ত 'ফুকুসিমার' জনগণের জন্য জানাচ্ছি।

ভোটের বাজারে ছিটমহল সমস্যা

পরিস্থিতির পরিবর্তন নিয়েও ভাবতে হবে

ছিটমহলগুলোর পরিবর্তিত পরিস্থিতি এবং ছিটমহল বিনিময় উত্তর সম্ভাব্য পরিস্থিতি সমূহের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা না করে ছিটমহল বিনিময়ের পথে এগোলে এমন কিছু সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে যা কিনা বর্তমান সমস্যার চেয়েও ভয়ঙ্কর হতে পারে।

সাধন কুমার পাল

একজন বাংলাদেশী নাগরিকের স্ত্রী ভোটে দাঁড়িয়েছেন, তাও মূলত বাংলাদেশীদের দুঃখ দুর্দশা নিরসনে ভারত সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির জন্য। এই ঘটনাটিই বোধহয় গত ১৮ এপ্রিল সমাপ্ত পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার প্রথমদফা নির্বাচনের সবচেয়ে ব্যতিক্রমী ঘটনা। হ্যাঁ, এখানে জন্মসূত্রে ভারতীয়, বিবাহসূত্রে বাংলাদেশী ছিটমহল পোয়াতুর কুঠির বাসিন্দা রহমান মিয়াঁর স্ত্রী, দিনহাটা বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী ময়মলা খাতুনের কথাই বলা হচ্ছে। ময়মলা খাতুন ভোটে জিতবেন কি হারবেন, কত ভোট পাবেন সে পরের কথা। কিন্তু বাংলাদেশী ছিটমহলের একজন গৃহবধূ বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী হয়ে স্বাধীনোত্তর ভারতে সবচেয়ে জটিল সমস্যাগুলোর অন্যতম যে ছিটমহল সমস্যার উপর আলো ফেলতে চেয়েছেন বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে সেটি অবশ্যই আলোচিত হওয়া দরকার।

ইন্টারন্যাশনাল বাউন্ডারি রিসার্চ ইউনিটের তথ্য অনুসারে ভারতে থাকা বিনিময় যোগ্য বাংলাদেশি ছিটমহলের সংখ্যা ৫১। কোচবিহার জেলা প্রশাসনের একটি সূত্রকে উদ্ধৃত করে তৈরি করা একটি সর্বভারতীয় দৈনিকের প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সহযোগিতায় তথ্য গোপন করে কম করে ৩০ শতাংশ ছিটমহলবাসী বাংলাদেশী এদেশের ভোটার তালিকায় নিজেদের নাম তোলাতে সক্ষম হয়েছে। দিনহাটা বিধানসভা কেন্দ্রে মোট ২৯টি বাংলাদেশী ছিটমহল রয়েছে। যেগুলিতে আনুমানিক ১৪০০ ভোটার রয়েছেন। ছিটমহলবাসী একজন গৃহবধূর সরাসরি নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া প্রমাণ করে যে বাংলাদেশের মূলভূখণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এই বাংলাদেশীরা চায় বিধিসম্মতভাবে ভারতের নাগরিকত্বের অধিকারী না হয়েও যে তাঁরা ব্যবহারিক দিক থেকে ভারতের নাগরিক হয়ে উঠেছেন, ভোট দিচ্ছেন এই বিষয়টি স্বীকৃতি পাক, প্রকাশ্যে আসুক। ছিটমহল নিয়ে কোনও রকম চূড়ান্ত ফয়সালা হওয়ার আগে ছিটমহলবাসী বাংলাদেশী নাগরিকদের একাংশের এই ভারতীয় নাগরিক হয়ে ওঠার বিষয়টিতে ভারতীয় আইন ব্যবস্থা কি প্রতিক্রিয়া দেয়, না দেখেও না দেখার ভান করে কিনা তা জানার জন্য আমাদের আরও অপেক্ষা করতে হবে।

তবে বাংলাদেশী ছিটমহলের যে সমস্ত বাসিন্দা এখনো ভারতীয় পরিচয় জ্ঞাপক কোনওরকম কাগজপত্র সংগ্রহ করতে পারেননি তারাও নিজেদের পরিচয় গোপন করে শিক্ষা, চিকিৎসার সুযোগ নিয়ে থাকে। আর দশটা ভারতীয় নাগরিকের মতো কাজের খোঁজে ভিন রাজ্যে যায়। খোঁজ নিলে দেখা যাবে বাংলাদেশী ছিটমহলের বাসিন্দাদের অনেকেরই ভারতের মূলভূখণ্ডে জমিজায়গা আছে। আর যাদের জমির মালিকানা পাওয়ার মতো বৈধ কাগজপত্র নেই, টাকা পয়সার জোর নেই তারাও অনেকে ভিনরাজ্য থেকে রোজগার করে এনে ভারতীয়দের জমি লিজ নিয়ে বা বন্ধক নিয়ে চাষবাস করছে। সবমিলে বাংলাদেশের ছিটমহলগুলোর সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে বলা যায় ভারতের বিধি ব্যবস্থার পক্ষে এদের জন্য বিধিসম্মত ভাবে তেমন কিছু করে ওঠা সম্ভব না হলেও এদেশের সমাজ ব্যবস্থা কিন্তু এই মানুষগুলোকে আপন করে নিয়েছে। ফলে আর দশটা ভারতীয় নাগরিকের মতো আইনি সুরক্ষা বা নাগরিক পরিষেবা না পেলেও এরা প্রায় সমান সামাজিক সুরক্ষা ভোগ করছে, যা কিনা ছিটমহলবাসীদের জীবন যন্ত্রণা লাঘব করতে অনেকটাই সহায়তা করেছে। ফলে ভবিষ্যতে ছিটমহল বিলোপ করে যদি এদের বাসিন্দাদের ভারতের নাগরিকত্ব বা বাংলাদেশের নাগরিকত্বের মধ্যে যে কোনও একটি বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হয় তা হলে কিছু ব্যতিক্রম বাদে বাংলাদেশের ছিটের বাসিন্দারা সবাই যে ভারতের নাগরিকত্ব গ্রহণ

করে এদেশেই থেকে যাবেন এ বিষয়ে তেমন কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

পরিচয় গোপন করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির সুবিধা আদায় করা, ছিটমহলের বাসিন্দাদের একাংশের মধ্যে পিছনের দরজা দিয়ে ছিটমহল ঘিরে থাকা দেশটির নাগরিক হয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা ভারতের মতো বাংলাদেশেও স্বাভাবিক ও সাধারণ ঘটনা। কিন্তু সামাজিক সুরক্ষার নিরীখে বিচার করলে দেখা যাবে বাংলাদেশে ভিতরে থাকা ১১১টি বিনিময় যোগ্য ভারতীয় ছিট মহলে ভারতের ভিতরে থাকা বাংলাদেশের ছিটমহলগুলোর ঠিক উল্টো চিত্র বিরাজ করছে। ভারতীয় ছিটমহলগুলোতে জবর দখল, জাল দলিল করে জমি হাতিয়ে নেওয়া, ক্ষেতের ফসল কেটে নিয়ে যাওয়া, জোর করে গরু-ছাগল, ভেড়া, হাস-মুরগির মতো গৃহপালিত পশুপাখি তুলে নিয়ে যাওয়া এবং এই সমস্ত ঘটনা ঘটাতে গিয়ে কোনওরকম ভাবে বাধাপ্রাপ্ত হলে মারধোর, খুন জখম, অগ্নিসংযোগ এমনকী বাড়ির মা বোনদের তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ ও খুনের মতো ঘটনাও ঘটে থাকে। এই ছিটমহল- গুলোতে মহিলারা এতটাই অসুরক্ষিত যে দেহে যৌবনের লক্ষণ ফুটে উঠার আগেই মা-বাবারা তাদের মেয়েদের বিয়ে দিতে বাধ্য হয়। ছিটের বাসিন্দা ভারতীয়দের বাংলাদেশের হাটবাজারগুলোতেও নানারকম ভাবে হেনস্থা হতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে ফসল বিক্রি করতে গিয়ে এরা যেমন নায্য দাম পায় না তেমনি কম দামে বিক্রি করতে না চাইলে জোর করে ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনা ঘটে। শুধুমাত্র বাংলাদেশী দুষ্কৃতিরাই নয় বাংলাদেশের জোতদার- জমিদারদের ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের একাংশও ছিটের জমি গ্রাস করার জন্যও এই ধরনের অন্যায় অত্যাচার চালায়। এমন উদাহরণও আছে ভারতীয় ছিটে ১২৮ বিঘা জমির মালিক জবর দখলের শিকার হয়ে সর্বস্ব খুইয়ে শুধুমাত্র প্রাণ বাঁচাতে ভারতের মূল ভূখণ্ডে আশ্রয় নিয়ে দিনমজুরি করে দিন কাটাচ্ছে। পাকিস্তানের কবল মুক্ত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে গঠনের পরও ছিটমহলবাসীদের চৌদ্দ পুরুষের ভিটে মাটি ছেড়ে ভারতের মূল ভূখণ্ডে আশ্রয় নেওয়ার দৃশ্যের তেমন কোনও পরিবর্তন হয়নি। একটি রিপোর্ট বলছে ১৯৭১ থেকে ১৯৯৭ পর্যন্ত ১২০০টি পরিবার ছিটমহল ছেড়ে ভারতের মূল ভূখণ্ডে আশ্রয় নিয়েছে। তবে ওয়াকিবহাল মহলের মতে এই সংখ্যাটি হিমশৈলের চূড়া মাত্র।

ছিটমহল বিনিময় আন্দোলনের সর্বশেষ প্রবণতা হলো যে এটি ক্রমশই স্থানীয় ভোটের রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এরশাদ সহ বিভিন্ন প্রভাবশালী রাজনীতিকের কণ্ঠে ছিটমহল- বাসীদের দুর্দশার কথা শোনা যাচ্ছে। এরফলে বাংলাদেশে থাকা ছিটমহলবাসী ভারতীয়দের মনে কিছু প্রশ্ন কিছু সংশয় কিন্তু ক্রমেই দানা বাঁধছে। যেমন, বিগত ছয়দশক ধরে তারা একশ্রেণীর বাংলাদেশীদের দ্বারা চূড়ান্তভাবে লাঞ্ছিত, অত্যাচারিত, ধর্ষিতা, লুণ্ঠিত হলেও বাংলাদেশের এক সময়ের সর্বেসর্বা এই রাজনীতিকরা খোঁজ নেওয়ার প্রয়োজন মনে করেননি কেন? এখন কি এই রাজনীতিকরা ছিটমহল বিনিময় হলে ভারতীয়রা ছিটমহল ছেড়ে ভারতের মূল ভূখণ্ডে আশ্রয় নেবে এবং তাদের জমিজায়গা- গুলো বাংলাদেশিদের হাতে তুলে দিয়ে ভোটের বাজারে ফয়দা তোলা যাবে ধরে নিয়ে এতটা সক্রিয় হয়ে উঠেছে?

স্বাভাবিকভাবেই এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে '৭৪-এর ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি অনুসারে ছিটমহল সমস্যা সমাধান হলে এর থেকে নতুন কোনও সমস্যা জন্ম নেবে কিনা তা পর্যালোচনা হওয়া দরকার। কারণ ১৯৪৭ আর ২০১১ এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে ছিটমহলগুলোর আর্থসামাজিক ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি অনেক পাল্টেছে। প্রায় সমস্ত দিক থেকে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী দেশ হিসেবে ভারতের নাগরিকত্ব বাংলাদেশের নাগরিকত্বের চেয়ে অনেক বেশি লোভনীয় এটাও এই সময়ের মধ্যে প্রমাণিত হয়েছে। ফলে দু'দেশের ছিটমহলের বাসিন্দাদের ভারতের নাগরিকত্ব ও বাংলাদেশের নাগরিকত্ব এই দুটোর মধ্যে একটিকে বেছে নিতে বলা হলে সবার পছন্দ যে ভারতই হবে এ বিষয়ে খুব একটা সন্দেহের অবকাশ নেই। আবার এই সময়ের মধ্যেই উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের নামে মরিচঝাঁপি, দণ্ডকারণ্যে ঘটেছে মানবতার ইতিহাসে জঘন্যতম ঘটনা। মানুষ দেখেছে শুধুমাত্র বাংলাদেশ থেকে আসা উদ্বাস্তুরাই নয়, বাংলাদেশে অবস্থিত ভারতীয় ছিটমহলগুলো থেকে নানারকম অত্যাচার, নিপীড়ন ও জবর দখলের শিকার উদ্বাস্তুরাও এদেশে সরকারি উদাসীনতায় কিভাবে দিনমজুরি খেটে, রিক্সাচালিয়ে, পাথর ভেঙে, অসম ওড়িশা, ঝাড়খণ্ডের মতো রাজ্যগুলোতে মজুরী খেটে কোনওরকমে বেঁচে আছে।

সবমিলে বলা যায় ৭৪-এর ইন্দিরা মুজিব চুক্তি অনুসারে ছিটমহল বিনিময় হলে বাংলাদেশে থাকা ভারতীয় ছিটমহলের প্রকৃত বাসিন্দারা উভয় সঙ্কটে পড়বে। কারণ বাংলাদেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে সেদেশে থাকার সিদ্ধান্ত নিলে একদিকে যেমন অতীত অত্যাচারের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে পুনরাবৃত্তি হওয়ার দুঃস্বপ্ন এদের তাড়া করে বেড়াবে, আবার অন্যদিকে নাগরিকত্ব রক্ষার জন্য ভারতের মূল ভূখণ্ডে আশ্রয় নিলে মরিচঝাঁপি, দণ্ডকারণ্যের ইতিহাস পুনরাবৃত্তি হওয়ার দুঃস্বপ্ন এদের পেছন ছাড়বে না। ছিটমহলগুলো থেকে উচ্ছেদ হওয়া দুচার জনের সঙ্গে কথা বললেই এটা পরিষ্কার হবে যে বাংলাদেশে থাকা ভারতীয় ছিটমহলগুলোর প্রকৃত বাসিন্দারা এমন ভাবে ছিটমহল সমস্যার সমাধান চান যাতে তাদের চৌদ্দপুরুষের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হতে না হয় আবার ভারতীয় নাগরিকত্বও বজায় থাকে। এটা একমাত্র সম্ভব যদি কিনা তিন বিঘার মতো করিডর দিয়ে ভারতীয় ছিটমহলগুলোকেও দেশের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া যায়। একটু খোঁজ নিলে দেখা যাবে বইখাতা, শালবাড়ি, কাজলদিঘি, বেউলডাঙ্গা, নাটকটকা, বাঁশকাটার মতো ভারতীয় ছিটের বাসিন্দারা কাঁটা তারের বেড়ার ওপারে আজ পর্যন্ত যতগুলো বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে তার প্রত্যেকটিতে তারা ভারত সরকারকে এই বার্তাটিই পাঠানোর চেষ্টা করেছে যে তিন বিঘার চেয়েও আয়তনে ছোট করিডোর বাংলাদেশের সঙ্গে কথা বলে আদায় করতে পারলে তাদের সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়ে যায়।

সামগ্রিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে এটা বলা যায় ভারত বাংলাদেশ ছিটমহল বিনিময়ের যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং যতটা দ্রুততার সঙ্গে সমস্যাটি সমাধান হবে ততই মঙ্গল। তবে সমস্যাটি সমাধানের সময় ছিটমহলগুলোর প্রকৃত বাসিন্দাদের মতামতটি গুরুত্বসহকারে বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে ভারতে থাকা বাংলাদেশের ছিটমহলগুলোর বাসিন্দাদের নিয়ে কোনও সমস্যা আছে বলে মনে হয় না। কারণ কিছু ব্যতিক্রম বাদে ওরা ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ করে ভারতেই থেকে যাবে এখনও পর্যন্ত সেরকমই জানা যাচ্ছে। সমস্যা হবে না বাংলাদেশেরও। কারণ কোনওরকম বাড়তি জনসংখ্যার চাপ না নিয়েও অনেকটা বাড়তি ভারতীয় ভূমি এই দেশটি পেয়ে যাবে। কিন্তু সমস্যা সৃষ্টি হবে ভারতে। কারণ ভারতের বর্তমান আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি কোনওভাবেই বিরাট সংখ্যক উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের অনুকূলে আছে বলে মনে হয় না। আবার ছিটমহলবাসীদের ইচ্ছে অনুসারে ১১১টি ছিটমহলকে করিডর দিয়ে ভারতের মূলভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করার ভাবনা-চিন্তাও বাস্তবসম্মত নয়। এই পরিস্থিতিতে আয়তনে বৃহৎ কয়েকটি ছিটমহলকে করিডোরের সাহায্যে ভারতের মূলভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করার প্রস্তাব নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করা যেতে পারে।

এই প্রস্তাবে সাফল্য পাওয়া গেলে অন্যান্য ছিটমহল থেকে উদ্‌বাস্তু হওয়া ভারতীয়দের করিডোরের সাহায্যে যুক্ত ছিটমহলগুলোতে পুনর্বাসন দেওয়া যেতে পারে। এছাড়াও ভারতীয় ছিটমহলগুলোতে জবর দখল নিয়ে ওঠা অভিযোগেরও একটি যুক্তিসঙ্গত মীমাংসা হওয়া দরকার। এক্ষেত্রে জবর দখলকারী ও প্রকৃত বাসিন্দাদের চিহ্নিতকরণের জন্য ১৯৭১ বা ১৯৭৪ সালকে ভিত্তিবর্ষ ধরে সেই সময় থেকে ছিটমহলে বসবাসের সাক্ষ্য প্রমাণ চাওয়া যেতে পারে। সবমিলে বলা যায় ছিটমহলগুলোর পরিবর্তিত পরিস্থিতি এবং ছিটমহল বিনিময় উত্তর সম্ভাব্য পরিস্থিতি সমূহের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা না করে ছিটমহল বিনিময়ের পথে এগোলে এমন কিছু সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে যা কিনা বর্তমান সমস্যার চেয়েও ভয়ঙ্কর হতে পারে।

ঘরেরও নয়, পরেরও নয়

মাঝখানে থাকার যম-যন্ত্রণা

অর্ণব নাগ

স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশে অবস্থিত ভারতীয় ছিটমহলের বাসিন্দাদের প্রতি ভারত সরকার উদাসীন। তাঁদের নাগরিক অধিকারটুকুর পাশাপাশি, ভোটাধিকার, শিক্ষার অধিকার, ন্যূনতম স্বাস্থ্য-পরিষেবা ও সামাজিক নিরাপত্তাটুকুও দেওয়া হয়নি। ভারত-বাংলাদেশ উভয় সরকারের গাফিলতির জন্যই উভয় দেশের ছিটমহলেই বাড়ছে উগ্রপন্থা। ফলে সেখানকার বাসিন্দারা, যাঁদের অন্য কোথাও ঠাঁই নেই, তাঁদের কাছে বেঁচে থাকাটাই আজ মূল্যবান হয়ে গেছে।

দেশভাগ বহু মানুষের জীবনেই বহু সর্বনাশের সাক্ষী। স্বাধীনতার পর অনেকগুলো বছর ভারতবাসী পেরিয়ে এলেও '৪৭-এর দেশভাগের গদগদে ঘা এখনও বহন করে চলেছি আমরা। ১৯১৮ সালে বাংলায় যে জনগণনা হয়েছিল, তার প্রতিবেদনে তৎকালীন ভারত সরকারের তথ্য-পরিসংখ্যান বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল ডব্লুউ ডব্লুউ হান্টার উল্লেখ করেছিলেন, ''কোচবিহার জেলা একটি চাষযোগ্য উর্বর কৃষিভূমি, ত্রিকোণাকৃতি, বহু নদী দ্বারা খণ্ডিত।'' সমস্যার গভীরতা লুকিয়ে ছিল তখনই। স্বাধীনতার সময় সিরিল র‍্যাডক্লিফের সরলরেখা বরাবর বিভাজনের নীতি কার্যকর হলে বহু নদী বিভক্ত কোচবিহার জেলাও তার ব্যতিক্রম হয়নি। হান্টারের উপরোক্ত বিশ্লেষণের পরেও কোচবিহার জেলায় র‍্যাডক্লিফ লাইন কিভাবে কার্যকর হলো তা অবশ্যই বিবেচনার দাবী রাখে। ফলতঃ এই বিভাজনের পরে কোচবিহারের কিছু অংশ ভারতে এবং বাকি অংশ তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে চলে গেল। কিন্তু এতেও সমস্যা মিটল না। স্বাধীনতার সময় কোচবিহার ও রংপুর ভারত কিংবা পাকিস্তান কোনও রাষ্ট্রেই যোগ দেয়নি। ১৯৫২ সালে কোচবিহার ভারতে এবং রংপুর পাকিস্তানে যোগ দেয়। ফলে সমস্যা এবার চূড়ান্ত আকার ধারণ করে। '৪৭-এ র‍্যাডক্লিফ লাইন কার্যকর হওয়ায় কোচবিহারের কিছু অংশ ভারতে, বাকি অংশ তৎকালীন পাকিস্তান (এখন বাংলাদেশ)-এ চলে গিয়েছিল। কিন্তু '৫২-এ অখণ্ড কোচবিহার আনুষ্ঠানিক ভাবে ভারতবর্ষের অঙ্গীভূত হলেও কোচবিহারের সেই অংশটা কিন্তু পাকিস্তানে থেকেই গেল। উল্টোদিক দিয়ে রংপুরের ক্ষেত্রেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হলো না। রংপুর পাকিস্তানে গেলেও, র‍্যাডক্লিফ লাইন মেনে তার কিছু অংশ কিন্তু থেকে গেল এদেশেই। যার ফলে, ভারতের কিছু অংশ এখনকার বাংলাদেশে এবং এখনকার বাংলাদেশের কিছু অংশ ভারতবর্ষে রয়ে গিয়েছে। এগুলিকেই বলা হচ্ছে ছিটমহল। ইংরেজি পরিভাষায় 'এনক্লেভ'।

বর্তমানে ২০ হাজার ৯৫৭.০৭ একর জমিতে ১৩০টি ভারতীয় ছিটমহলের অবস্থান বাংলাদেশে। পক্ষান্তরে ১২ হাজার ২৮৯.৩৭ একর (অর্থাৎ ৪ হাজার ৯৭৩.৪ হেক্টর) জমিতে ৯৫টি বাংলাদেশী ছিটমহল রয়েছে ভারত-ভূমিতে। কয়েক বছর আগে অক্সফাম বলে একটি বেসরকারী সংস্থার সমীক্ষায় একটি ভয়ঙ্কর তথ্য উঠে এসেছিল যে ভারতীয় ছিটমহলের প্রায় দেড় লক্ষ বাসিন্দার কোনও নাগরিক-পরিচয়পত্র নেই। তাঁরা না ভারতের নাগরিক, না বাংলাদেশের নাগরিক। তবে তাঁরা কোথাকার বাসিন্দা? কোন দেশের নাগরিক? উত্তর দেবার কেউ নেই, ৬৪ ছুঁতে চলা স্বাধীনতার কয়েক মাস আগেও। ভারত বা বাংলাদেশ উভয় সরকারই এদের ঝেড়ে ফেলতে পারলে বাঁচেন। ভারত কিংবা বাংলাদেশ কোনও দেশের জনগণনাতেই এঁরা গুণতির মধ্যে আসেন না। এছাড়াও বাংলাদেশে অবস্থিত ভারতীয় ছিটমহলগুলির অন্যান্য বাসিন্দাদের অবস্থান সঙ্গীন বললেও কম বলা হয়। তাঁদের হয়তো ভোটার পরিচয়পত্র রয়েছে। এবারও ভোটের দিন তাঁদের জন্য বি এস এফের অবারিত দ্বার ছিল। কিন্তু ওটুকুই। তাঁরা কোথাকার বাসিন্দা নিজেরাই জানেন না! সুতরাং কোনও রাজনীতিকেরই গরজ পড়েনি এলাকার উন্নয়ন করার। যেটুকু হয়েছিল তা সেই স্বাধীনতার আগে। স্বাধীনতার পর বিশ্ব কয়েক কদম এগিয়ে গেলেও তাঁরা যে তিমিরে ছিলেন, সেই তিমিরেই আছেন। বরং কয়েক কদম পিছিয়েই গেছেন। সেখানে না আছে পানীয়, না বিদ্যুৎ, না শিক্ষার সুব্যবস্থা, না চিকিৎসার বন্দোবস্ত। বি এস এফ কখন কাঁটাতারের বেড়া খুলে দেবে তার জন্য সকালের দিকে অধীর প্রতীক্ষা। এপারে এসেও শান্তি নেই। বিকেল ৪টের মধ্যেই সব কাজ মিটিয়ে ফিরতে হবে ছিটমহলে। নইলে ওইদিন আর ফেরা হবে না, বি এস এফ গেট বন্ধ করে দেবে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে যাঁরা অবগত রয়েছেন তাঁরা সকলেই জানেন সেদেশের রাজনীতিতে কিরকম ভারত-বিরোধী চোরাস্রোত রয়েছে। বিশেষ করে খালেদা জিয়ার বি এন পি-র ক্ষমতায় আসীন হওয়ার মূল কারণই ছিল উগ্র ভারত-বিরোধিতা। যেহেতু ভারতের জমি (ছিটমহল) বাংলাদেশের খাসমহলে, সুতরাং ঝামেলা পাকানোর চেষ্টা বাংলাদেশ করবেই। হয়েছেও তাই।

বাংলাদেশে থাকা ১৩০টি ভারতীয় ছিটমহল সন্ত্রাসবাদীদের নিশ্চিন্ত স্বর্গে পরিণত হয়েছে। কামতাপুর লিবারেশন অর্গানাইজেশন (কে এল ও)-এর বহু প্রশিক্ষণ শিবির ওই ছিটমহল এলাকায় রমরমিয়ে চলছে। আসলে ভারতীয় 'মেনল্যান্ড' থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে বি এস এফের নজরদারির আড়ালে উগ্রপন্থা ও সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মে বাধা দেওয়ার কেউ নেই। সম্প্রতি বি এস এফ ইন্টেলিজেন্সের রিপোর্ট বলছে, এইসব অধিকাংশ ছিটমহলেই লুকিয়ে রয়েছে জঙ্গিরা এবং অপারেশান ফ্ল্যাশ আউটের আগে পর্যন্ত কিছু বাংলাদেশী সন্ত্রাসবাদী সংগঠন যেমন আওয়াল, সানওয়ারা, মোতালেব প্রভৃতি তাদের প্রশিক্ষণ শিবির কে এল ও-র সহযোগিতায় নির্বিঘ্নেই চালিয়ে এসেছে বাংলাদেশের দেবীগঞ্জ জেলার দহলা খাগড়াবাড়ি এবং বাসুনিয়াপাড়ার মতো ভারতীয় ছিটমহলে। আসলে স্বাধীনতার পর থেকে আজ অবধি কোনও জনগণনাতেই ছিটমহলের বাসিন্দারা অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার জন্য ভারতীয় ছিটমহলের বাসিন্দাদের প্রকৃত সংখ্যা কত, সে সম্পর্কে কোনও সুনির্দিষ্ট সরকারী তথ্যই নেই। ভারতীয় ছিটমহলে তাদের শক্তিবাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই জঙ্গিগোষ্ঠীগুলি সংগঠিত আক্রমণ করে সেখানকার বাসিন্দাদের ঘরছাড়া করেছে। কিছুদিন আগেই বাংলাদেশী সংবাদমাধ্যমে খাগড়াবাড়ি থেকে বাসিন্দাদের উচ্ছেদের খবর প্রকাশিত হয়েছিল। এভাবে গত কয়েক বছরে বহু মানুষ তাঁদের ছিটমহলের বাসস্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। বেসরকারী মতে এই সংখ্যাটা তিন লক্ষের কম নয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে—ছিটমহল ত্যাগ করে এঁরা গেলেন কোথায়? বাসিন্দারা হিন্দু হলে বাংলাদেশ তাদের ভূ-খণ্ডে এঁদের ঠাঁই দেবে না। আবার ওঁরা ভারতে প্রবেশ করলেও নাগরিক পরিচয়পত্র মিলবে না। দ্বিতীয় কেন, তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়েই থাকতে বাধ্য হবেন তাঁরা। এ যেন এক অসহনীয় পরিবেশ। যেখানে মানুষের মতো বাঁচা এক অর্থে অকল্পনীয়, গরু-ছাগলের মতো বাঁচতেও নিত্য-নতুন সংগ্রামের মুখোমুখি ভারতীয় ছিটমহলের মানুষ।

কিন্তু যে বাসিন্দারা শত অত্যাচারেও ছিটমহল ত্যাগ করেননি, কিভাবে বেঁচে থাকেন তাঁরা? উদ্বেগের ব্যাপার হচ্ছে, বি এস এফ কখনও কখনও বাংলাদেশী ছিটমহলের বাসিন্দাদের চিকিৎসার জন্য, বাজার-দোকান করার জন্য এদেশের মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ করার অনুমতি দেন। যে সুযোগ কাজে লাগিয়ে উপযুক্ত প্রমাণপত্র পেশ না করেই বহুলোক ভারতীয় ভূ-খণ্ডে ঢুকে পড়ার সুযোগ পাচ্ছে। যাদের মধ্যে বাংলাদেশী এবং জঙ্গিগোষ্ঠীর লোকজনই সর্বাধিক। আবার স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশে অবস্থিত ভারতীয় ছিটমহলের বাসিন্দাদের প্রতি ভারত সরকার উদাসীন। তাঁদের নাগরিক অধিকারটুকুর পাশাপাশি, ভোটাধিকার, শিক্ষার অধিকার, ন্যূনতম স্বাস্থ্য-পরিষেবা ও সামাজিক নিরাপত্তাটুকুও দেওয়া হয়নি। ভারত-বাংলাদেশ উভয় সরকারের গাফিলতির জন্যই উভয় দেশের ছিটমহলেই বাড়ছে উগ্রপন্থা। ফলে সেখানকার বাসিন্দারা, যাঁদের অন্য কোথাও ঠাঁই নেই, তাঁদের কাছে বেঁচে থাকাটাই আজ মূল্যবান হয়ে গেছে। সেইসঙ্গে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় ভারতীয় নাগরিক তথা ভারতের ক্ষেত্রেও এটা অশনি-সংকেত হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ এই জটিল পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে কয়েকবছর পূর্বে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো আন্দোলন শুরু করেছিল যে, তিন বিঘা করিডর বাংলাদেশী নাগরিকদের জন্য চব্বিশ ঘণ্টাই খুলে দিতে হবে। আসলে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের উত্তেজনাটাকে নিজেদের মুঠোর মধ্যে নিয়ে আসতে চাইছে বাংলাদেশ। ভারতে অবস্থিত ৯৫টি বাংলাদেশী ছিটমহলের মধ্যে আঙরাপোতা-দহগ্রাম ছিটমহলটি সবচেয়ে বড়। সেটি বাংলাদেশের 'মেনল্যান্ড' থেকে অন্ততঃ দু-শো গজ দূরে অবস্থিত। বাকি ছিটমহলগুলিও বাংলাদেশী ভূখণ্ড থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন। ভারতের স্বাধীনতার সময় থেকেই সেখানে করিডর করার দাবী উঠেছিল এবং এ নিয়ে কয়েকপ্রস্থ কথাও হয়। ১৯৯২ সালের ২৬ জুন পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর উদ্যোগে বাংলাদেশী নাগরিকদের 'বিনা বাধায়' ভারতে প্রবেশের জন্য তিন বিঘা করিডর স্থাপনের সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক ও কূটনৈতিকভাবে মারাত্মক ভুল, যে কারণে আজকের দিনে অনুপ্রবেশ সমস্যা এতটা মারাত্মক হয়ে গিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর এই ভুলের সুযোগ বাংলাদেশ কিভাবে নিল তা দেখা যাক। চুক্তি সই হবার পর বি এস এফ প্রথমে এক ঘণ্টা অন্তর দিনে ছ'বার তিন বিঘা করিডর খুলে রাখত। বাংলাদেশ সরকার দাবী তুলল আরও বেশি সময় ধরে তাদের নাগরিকদের এদেশে আসার জন্য করিডর খুলে রাখতে হবে। ২০০১ সালের ২৭ এপ্রিল সেই দাবীও মেনে নিয়ে সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যে ৬টা অবধি করিডর বাংলাদেশীদের জন্য উন্মুক্ত করে দিল বি এস এফ। সহজবোধ্য কারণেই এদেশে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশের হার চড়চড় করে বাড়তে লাগলো এবং বর্তমানে বি এন পি প্রভৃতি বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলি চব্বিশ ঘণ্টাই তিন বিঘা করিডর খুলে রাখার দাবী জানাচ্ছে। গত মার্চে ঢাকায় ডি জি পর্যায়ের বৈঠকে এনিয়ে একপ্রস্থ আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বি এস এফ সূত্রে জানা যাচ্ছে সেই বৈঠকের যাবতীয় কথাবার্তাই কেন্দ্রীয় সরকারকে জানানো হয়েছে। বি এস এফ কর্তৃপক্ষ এও মনে করছেন, করিডর চব্বিশ ঘণ্টা খুলে রাখলে সারারাতও তা অরক্ষিত থাকবে এবং রাতের অন্ধকারে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ আরও ব্যাপকহারে বাড়বে। যদিও এদেশের বাংলাদেশপ্রেমী ও সেকুলারবাদীদের 'বলার মতো' অস্ত্র তুলে দিয়ে বাংলাদেশও ৩ কিমি দীর্ঘ তাদের তেঁতুলিয়া করিডর ভারতবাসীর জন্য খুলে দিয়েছে। যে অস্থির রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির শিকার হয়ে ওপার থেকে হিন্দুরা ধর্ম ও মান বাঁচাতে এদেশে পালিয়ে আসতে বাধ্য হচ্ছেন, সেখানে এপার থেকে ওপারে হিন্দুদের যাওয়ার জন্য তেঁতুলিয়া করিডর খুলে রেখে কোন লবডঙ্কাটা হবে? এদেশের প্রকৃত নাগরিক মুসলমানরাও বা খামোকা তেঁতুলিয়া করিডর দিয়ে ওপারে যাবেন কেন? ফলতঃ যেটা হচ্ছে এ দেশের গরু, মোষ বাংলাদেশে নির্বিঘ্নে পাচার হয়ে যাচ্ছে রাতের অন্ধকারে।

এই প্রবন্ধের গোড়াতেই প্রশ্ন তোলা হয়েছিল যে নিজভূমি থেকে উৎখাত হওয়া ভারতীয় ছিটমহলের মানুষগুলো তবে যাচ্ছেন কোথায়? উত্তরটা দেওয়া যাক। বেসরকারী মতে ছিটমহলের অন্তত ৫০,০০০ বাসিন্দা পূর্ব ভারত ও উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন। '৭১ যুদ্ধের পর বেউলডাঙ্গা (ছিট নং-৩৪) থেকে বহু মানুষ চলে যান তিস্তা নদীর ধারে; জলপাইগুড়ি প্রভৃতি এলাকায়। গরমকালে তিস্তা নদীর চর শুকিয়ে গেলে বোল্ডার সংগ্রহ করে অন্ন-সংস্থান (অন্নের সংস্থান এতে আদৌ সম্ভব কি?) করেন ছিটমহলের সেই বাসিন্দারা। অক্সফাম জানাচ্ছে সরকারী গণবন্টন প্রক্রিয়ার অঙ্গীভূত হননি অন্তত ৭৭ শতাংশ ছিটমহলের মানুষ। মেচি নদীর তীরে দার্জিলিঙের দক্ষিণাংশে কাদামোনিজাত হলো ছিটমহলের ৮৫ ঘর বাসিন্দার অপর একটি নতুন বাসস্থান। তবে খুব নতুন নয়। কারণ কাদামোনিজাতের বাসিন্দা সাঁওতাল ও ওরাং গোষ্ঠীর লোকেরাই সর্বপ্রথম ছিট্‌মহল থেকে উৎখাত হন, স্বাধীনতার ঠিক পরপরই। মেচি নদী পেরোলেই নেপাল, পূর্বদিকে একটু এগোলেই বাংলা-বিহার সীমান্ত। তাই মরসুমী চাষ ছাড়াও, শ্রমিক হিসেবেও তাঁরা সহজলভ্য। নেপাল সীমান্তে বদরপুরে রাইস মিলে তাঁরা শ্রমিকের কাজ করেন। একথা আজ আর অস্বীকার করার উপায় নেই যে, দীর্ঘদিনের বঞ্চনার রোষ ক্রমাগত ধূমায়িত হচ্ছে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা ছিটমহলের বাসিন্দাদের মধ্যে। উত্তরবঙ্গের সর্বত্র আজ যে একপ্রকার বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা গড়ে উঠছে, ছিটমহলের বাসিন্দাদের তাতে অনিবার্য যোগদান প্রকৃতির সাজিয়ে দেওয়া ডালিকে যে গনগনে আঁচে সেঁকে নিচ্ছে তা না বললেও চলে।

১৯৭৪ সালে ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তিতে ছিটমহল বিনিময়ের একটা প্রসঙ্গ উঠেছিল। আসলে তখন '৬৫-'৬৭তে ভারত-পাক যুদ্ধের আবহ, '৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অসাধারণ সহযোগিতা সব মিলিয়ে ছিটমহল সমস্যার সমাধানে আন্তরিক উদ্যোগ নিয়েছিল দু'পক্ষই। কিন্তু পরে এনিয়ে সেভাবে কথা না এগোলেও ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে বড় রদবদল এল। ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ মুসলিম বাংলাদেশে পরিণত হলো। অনিবার্যভাবেই ভারতের বিরুদ্ধে বর্তমান যুদ্ধে ছিট্‌মহল হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের বড় হাতিয়ার। আর ভয়টা সেখানেই।

কানাগলি থেকে মুক্তি

অন্য রকম

গীতু আন্না জোশ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারতীয় বংশোদ্ভূত কথাটা ইদানীংকালে ফুটবল খেলায়, মূলতঃ আন্তর্জাতিক ফুটবলে বেশ রমরমিয়ে চলছে। বৃটিশ কিংবা স্প্যানিশ লিগে খেলে অনেকে ফুটবলারের গায়েই এই তকমাটা দিব্যি সেঁটে গেছে। অনেকটা দুধের সাধ ঘোলে (নাকি গোলে!) মেটাবার মতোই বিশ্বকাপ কিংবা বিশ্বমানের খেলায় খেলতে না পারার আক্ষেপ সেই 'ভারতীয় বংশোদ্ভুত'-এর মধ্যে দিয়েই মিটিয়ে নিই। এটা ঠিক যে, সেই 'ভারতীয় বংশোদ্ভূত'-এর শেকড় এই হিন্দুস্থানই। কিন্তু তাঁদের বিশ্বমানের করে তৈরি করতে স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের আদৌ কোনও অবদান আছে কি?

এই আক্ষেপবাদীদের এহেন আক্ষেপ এবার কিছুটা হলেও কমতে চলছে। তবে ফুটবলে নয়, বাস্কেটবলে। যদিও দু'টো বস্তুর অন্তিমে 'বল' শব্দটি থাকলেও ফুটবলের মর্যাদার কাছে বাস্কেটবল? নিতান্তই বালক! তবে এটা ভারতীয়দের ধারণা, আমেরিকানদের নয়। সেখানে বাস্কেটবলের যা মর্যাদা, তার ধারে-কাছে ফুটবল ঘেঁষতে পারে না। সেখানকার অত্যন্ত জনপ্রিয় ও অতি-প্রতিযোগিতামূলক টুর্নামেন্টটির নাম আমেরিকান উত্তম্যানস ন্যাশনাল বাস্কেটবল লীগ। এবং ভারতবাসীদের সব আক্ষেপ মিটিয়ে মহিলা বাস্কেটবলার গীতু আন্না জোশ গত বাইশে এপ্রিল উড়ে গেছেন আমেরিকায়। চারদিনের ট্রেনিং সমাপ্ত হয়েছে তাঁর। যতদূর জানা যাচ্ছে, আসন্ন আমেরিকান উত্তম্যানস ন্যাশনাল বাস্কেটবল লীগ-এ সেরা দুই দল চিকাগো স্কাই কিংবা লস অ্যাঞ্জেলস স্পার্কসের হয়ে খেলার উজ্জ্বল সম্ভাবনা তাঁর।

ওসব বংশোদ্ভুত-টুত নন তিনি। ২৫ বর্ষীয়া গীতু'র জন্ম খোদ কেরলে। থাকেন চেন্নাইয়ে। দক্ষিণ রেলের চাকুরে। কিন্তু আমেরিকান লীগে তিনি খেলবেন বলেই 'অন্যরকম', এটা ভাবার কোনও কারণ নেই। অস্ট্রেলিয়ান লিগেও রিংহুড হুকসের মতো সেরা টিমে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে এসেছেন তিনি। বাস্কেটবল খেলায় যেটা সবচেয়ে দরকার হয় সেই উচ্চতার নিরীখে অন্যান্য মেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীকে কয়েক কদম পেছনে ফেলে দিয়েছেন তিনি। গীতার উচ্চতা ৬ ফুট ১ ইঞ্চি, মেয়েদের মধ্যে এই উচ্চতাধারিণীদের জিরাফের সঙ্গে তুলনা করাই চলে। আমেরিকার মহিলা বাস্কেটবল কোচ টামিকা রেমন্ড তাঁকে নিঃসন্দেহে করে তুলেছে আত্মবিশ্বাসী। এশিয়ান গেমসে তাঁর আশাতীত সাফল্যে রেমন্ডের ভূমিকার কথাই সর্বাগ্রে উল্লেখ করছেন গীতু। আসলে আমেরিকার এই মহিলা বাস্কেটবল লীগে এখনও অবধি কোনও ভারতীয়ই খেলার সুযোগ পাননি। আন্তর্জাতিক স্তরেও যেখানে এতগুলো দেশের অংশগ্রহণ (এর থেকে ক্রিকেটকে বাদ দেওয়া উচিত। কারণ ক্রিকেটটা মাত্র গোটা ষোলো দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ), সেখানে ক'টা ভারতবাসীই বা অংশগ্রহণের সুযোগ পায়? এর আগে আমেরিকার স্কুল লিগে খেলার সুযোগ অল্পের জন্য হাতছাড়া হয়েছিল তাঁর। এবার আর সেই ভুল করতে চান না গীতু।

তবে তিনি আমেরিকান লীগে খেলার সুযোগ পান আর নাই পান, ভারতীয় বাস্কেটবল তো বটেই, সেইসঙ্গে ভারতীয় ক্রীড়াজগৎকেও (ক্রিকেট বাদে) যেভাবে কানাগলি থেকে বেরোনোর পথ দেখালেন, তাতে গীতু আন্না জোশ কিন্তু অন্যান্যদের থেকে একটু 'অন্যরকম' তো বটেই।

সেবা ও ভালবাসার অবতার

সত্য সাই বাবা সমাহিত

প্রতিবেদক॥ মহাভিনিষ্ক্রমণ। পুত্তাপূর্তির সত্য সাই বাবা-র জীবনাবসানকে এভাবেই বর্ণনা করেছেন ভক্তেরা। গত ২৭ এপ্রিল অন্ধ্রপ্রদেশের পুত্তাপূর্তির প্রশান্তি নিলয়ম আশ্রমের কুলবন্ত হল-এ পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তথা মূলত হিন্দু আচার-বিধি শেষেই সমাহিত হলেন সত্য সাই। মাত্র এক মাস আগে ১৮ মার্চ কর্ণাটকের পুত্তুরে প্রতিনিধি সভার বৈঠক শেষে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় অধিকারীরা সাই বাবাকে দর্শনের জন্য পুত্তাপূর্তির প্রশান্তি নিলয়ম-এ গিয়েছিলেন। সাইবাবাকে দর্শন ও প্রণামের পর বিশ্বহিন্দু পরিষদের অধ্যক্ষ অশোক সিঙ্ঘল সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত ও নিবর্তমান সরসঙ্ঘচালক সুদর্শনজী এবং সরকার্যবাহ ভাইয়াজী যোশীসহ সকলের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। প্রত্যুত্তরে তেলেগু ভাষায় সাই বাবা যা বলেছিলেন তার অর্থ হলো—আনন্দ হচ্ছে; আনন্দ হচ্ছে।

বছর কয়েক আগে পুর্তাপূর্তির প্রশান্তি নিলয়মে গিয়ে সাই বাবাকে দর্শন ও দূর থেকে প্রণাম করার সৌভাগ্য এই প্রতিবেদকের হয়েছিল। সেদিন সকাল ৯টা নাগাদ কুলবন্ত হলে সমবেত কয়েক হাজার ভক্ত আকুল হৃদয়ে তাঁর আগমন প্রতীক্ষা করেছিলেন। সকলেই ধ্যানস্থ আত্মমগ্ন। একটি পিন পড়লেও শব্দ শোনা যাবে এমন নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল। এইরকম সময়ে যেরকম বেশে তাঁকে আমরা ছবিতে দেখে থাকি, সেই গেরুয়া আলখাল্লা পরিহিত বেশে একটি হুইল চেয়ারে বসে তিনি এলেন। ভক্তদের আকুতি একটু মৃদু গুঞ্জন ধ্বনি হয়ে সভাস্থলে ছড়িয়ে পড়ল। নির্দিষ্ট স্থানটিতে তিনি প্রায় আধঘণ্টা দর্শন দিলেন। কিছু কথাও বললেন। দূরে থাকার জন্য তা অবশ্য শুনতে বা বুঝতে পারিনি। মাঝে মাঝে কাপড় দিয়ে মুখ মুছছিলেন। ভক্তদের দিকে সহাস্যে হাত নাড়ছিলেন। এক প্রশান্ত আনন্দঘন মূর্তি। চোখ বুজলেই যা এখনও মানসপটে স্পষ্ট ভেসে উঠে। নির্দিষ্ট সময় শেষে তিনি ফিরে গেলেন। সঙ্গী বন্ধু মানিকদাকে নিয়ে প্রশান্তি নিলয়ম থেকে যখন বেরিয়ে এলাম, স্বামীজীর সেই পঙক্তিটি তখন মনে পড়ছিল—'চিত্তের প্রসন্নতা ভেঙো না কখনও।'

তিনি বলতেন, তিনি স্বয়ং ঈশ্বর। একই শরীরে স্বয়ং শিব আর পার্বতী। বেদান্তের 'সোহং'। অবতার পুরুষ। সিরডির সাই বাবার দ্বিতীয় অবতার। তাই কেউ শিষ্য নয়, সবাই ভক্ত। ওম সাইরাম।

কি তাঁর বাণী? 'অর্থ বা সম্পদ ত্যাগের কথা বলছি না। আমরা ত্যাগ করব বাসনা ক্রোধ এবং ঘৃণা।' সবাইকে ভালবাসাই ঈশ্বরের সেবা—পূজা। তাই বোধহয় তাঁর ঘোষিত ভবিষ্যত অবতারের নাম—প্রেম সাই। ভালবাসাই ঈশ্বর।

সত্য সাই সেন্ট্রাল ট্রাস্ট পরিচালিত সেবাকাজ

- **সত্য সাই সেন্ট্রাল ট্রাস্ট দ্বারা অনুমোদিত ১৬৫টি দেশে বিস্তৃত ১২০০টি সংগঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সেবা কাজ হয়ে চলেছে।**
- **পুত্তাপূর্তিতে প্রশান্তি নিলয়ম আশ্রম এবং হোয়াইটফিল্ড-এ বৃন্দাবন আশ্রম।**
- **পুত্তাপূর্তি এবং ব্যাঙ্গালোরের কাছে হোয়াইটফিল্ডে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত হাসপাতাল।**
- **দুইটি চক্ষু চিকিৎসাসহ আরও কয়েকটি ছোট-বড় হাসপাতাল।**
- **মেডিকেল কলেজ সহ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।**
- **পুত্তাপূর্তিতে সত্য সাই বিশ্ববিদ্যালয়।**
- **পুত্তাপূর্তিতে চৈতন্য জ্যোতি স্টেডিয়াম, প্ল্যানেটোরিয়াম, হিল ভিউ স্টেডিয়াম।**
- **অন্ধ্রপ্রদেশের পূর্ব ও পশ্চিম গোদাবরী, অনন্তপুর, মেডাক, মেহবুবনগর জেলার প্রায় ৭০০ গ্রামে পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্প। শুধু অনন্তপুর জেলাতেই পানীয় জল সরবরাহের জন্য বরাদ্দ ৩০০ কোটি টাকা।**
- **চেন্নাই-তে জল সরবরাহের জন্য প্রচুর অর্থ সাহায্য।**
- **ব্যাঙ্গালোর, হায়দরাবাদ ও চেন্নাই-তে যথাক্রমে সত্যম, শিবম ও সুন্দরম নামাঙ্কিত বৈদিক কেন্দ্র।**
- **রেডিও সাই গ্লোবাল হারমনি নামে একটি ডিজিটাল রেডিও স্টেশন।**

স্থিতিশীল সরকারের সম্ভাবনা কম অসমে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ অসমে বিধানসভার নির্বাচন শেষ হয়ে গেছে ১১ এপ্রিল। বিভিন্ন দলের প্রার্থীদের 'জয়-পরাজয়' এখন বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্রে বন্দী। তাই বলে কিন্তু দলীয় রাজনীতি থেমে নেই। থেমে নেই নতুন জোট তৈরির জন্য নানারকম হিসেব-নিকাশ এবং সেই হিসেবকে ভিত্তি করে আগাম পরিকল্পনা মাফিক জোট তৈরির রাজনীতি।

প্রথম যে হিসাবটা নিয়ে ভাঙাগড়ার নেপথ্য-খেলা জমে উঠেছে তা হলো—কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাচ্ছে না। গতবারও পায়নি। তবে গতবার তরুণ গগৈকে মুখ্যমন্ত্রীত্ব উপহার দিয়েছিল হাগ্রামা বসুমাতারির বড়ো পিপলস্ ফ্রন্টের (বি পি এফ) বারোজন বিধায়কের সমর্থন। প্রকাশ্যে ওই সমর্থনের পিছনে কোনও শর্তের কথা শোনা না গেলেও কিছু যে ছিল সেটা এবার নির্বাচনের মুখে প্রায় প্রকাশ্যে এসে গেছে। বি পি এফ-এর অলিখিত শর্ত ছিল বড়ো অধ্যুষিত এবং প্রভাবাধীন এলাকায় কংগ্রেস তার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত রাখবে। এবারকার নির্বাচনে কার্যক্ষেত্রে তা আদৌ হয়নি। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভুবনেশ্বর কলিতা চুটিয়ে প্রচার করেছেন প্রার্থী দিয়ে। বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই হয়েছে। ফলে বড়ো জনজাতিদের দলটি যদি ৭/৮টি আসন জেতে তাহলে আদৌ তারা কংগ্রেসকে সমর্থন এবার করবে কিনা সেটা নিয়েই সন্দেহ দেখা দিয়েছে। অপরপক্ষে, শাসক জোটের আসনসংখ্যা যে দশ-বারোটি কমবে তা তাবৎ নির্বাচনী বিশেষজ্ঞ ও বিশ্লেষকদের বক্তব্যে উঠে এসেছে।

প্রফুল্ল মহান্ত *তরুণ গগৈ*

বদরুদ্দিন *রঞ্জিত বিসওয়াল*

এবার প্রমুখ দুই বিরোধী দল বিজেপি ও অগপ জোট ভেঙে নির্বাচন লড়েছে। শাসক দলের যে আসন কমবে তা বিরোধী জোটের ভাগ্যে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। গত বিধানসভার বিরোধী দলনেতা (অগপ) চন্দ্রমোহন পাটোয়ারীর নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠী নির্বাচনী ফলাফলের পর আবার হাত ধরাধরি করার পক্ষে। অপরপক্ষে একদা অসম গণপরিষদ থেকে বিতাড়িত এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল মহন্তরা আবার সংখ্যালঘুদের সমর্থন অর্থাৎ বদরুদ্দিন আজমলের দল এ আই ইউ ডি এফ-এর সঙ্গে যেতে আগ্রহী। সেক্ষেত্রে দল মূল অসমীয়া এবং ভূমিপুত্রদের বিরাগভাজন হবে। বদরুদ্দিন আজমল আবার জানিয়ে দিয়েছেন আগে থেকে তারা কাউকে সমর্থনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন না।

যতদূর খবর, বিজেপি নেতারা অগপ এবং বি পি এফ উভয় দলের সঙ্গেই যোগাযোগ রেখে চলেছেন।

নির্বাচন পরবর্তী অনুমান মোতাবেক এবার যে দলগত অবস্থান দাঁড়াতে পারে—

কংগ্রেস—৪০ থেকে ৪৫, অগপ—৩৮ থেকে ৪২, বিজেপি—১৫ থেকে ১৮টি, এ আই ইউ ডি এফ—১০ থেকে ১২টি, অন্যরা—৮ থেকে ১৪টি। অসম বিধানসভার মোট আসন সংখ্যা ১২৬টি।

অগপ-র নেতৃত্বে বি পি এফ এবং বদরুদ্দিনের দলের সমর্থন নিয়ে সরকার গঠনের কথা কেউ কেউ বলছেন, সেক্ষেত্রে অগপ দলের তাত্ত্বিকদের অনুমান—আপাতত ক্ষমতা করায়ত্ত হলেও অদূর ভবিষ্যতে বর্ণহিন্দু এবং অসমীয়াদের সমর্থন হারাতে পারে। সব মিলিয়ে স্থায়ী ও স্থিতিশীল সরকারের সম্ভাবনা কম দেখা যাচ্ছে।

ব্যথা নিরাময়ে হু'র প্রশংসা পেল কেরল

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বর্তমান বিশ্ব-জটিলতার যুগে আধুনিক চিকিৎসা- বিদ্যায় শিক্ষিত ডাক্তারেরা রোগ উপশমে বিশেষ গুরুত্ব দেন না, দেন ব্যথা উপশমে। আর এই উপশমে তাঁদের ভরসা কিছু 'পেন রিলিফ' মার্কা ওষুধ যেমন অ্যানালজেসিস বা নিদেনপক্ষে মরফিন। কিন্তু আদতে রোগ নিরাময়ে এই ওষুধগুলি মোটেও কার্যকরী ভূমিকা নেয় না। বরং এদের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার মানবদেহে বিপদের বার্তা বয়ে আনে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন বা হু)-র বিচারে এখানেই সাফল্য পেয়েছে কেরল। সেখানে গড়ে তোলা হয়েছে প্যালাইটিভ কেয়ার সেন্টার। ব্যথা উপশমের অব্যর্থ ওষুধ নিমেষে মেলে সেখানে। এটাও আরেকটা দিক। ব্যথা-নিরোধক ওষুধের আকাল দেশের সর্বত্র। তাই 'পেন-রিলিফ' সহজলভ্য করায় হু-র সপ্রশংস অভিনন্দন কুড়িয়েছে কেরল। সেই সঙ্গে ওষুধের ব্যথা-নিরোধক ভূমিকার সঙ্গে রোগ উপশমের কার্যকরী ক্ষমতাও 'হু' বিবেচনায় রেখেছে বলে জানা যাচ্ছে।

ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন তাদের সাম্প্রতিকতম রিপোর্টে উল্লেখ করেছে দক্ষিণভারতীয় এই রাজ্যটি (অর্থাৎ কেরল) কমিউনিটিকেন্দ্রিক প্যালাইটিভ কেয়ার সেন্টার গড়ে তুলেছে। প্রান্তিক অসুখের আরোগ্যের নিরীখে কমিউনিটি অংশগ্রহণে কেরলকে বিশ্ব-নেতা হিসেবেও অভিহিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যন্ত্রণা উপশমের চিকিৎসার জন্য কেরলই সর্বপ্রথম প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি এক করে যন্ত্রণা উপশম কেন্দ্র গড়ে তোলার ব্যাপারে নজর দিয়েছিল।

কেরলের ভেষজসম্পদ।

নারকোটিক এবং মানসিক রোগের (সাইকোট্রপিক) জন্য ওষুধ প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতাদের আন্তর্জাতিক কনভেনশনে নিয়ন্ত্রিত ওষুধগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। যাইহোক, মাত্র ৬টি উন্নতদেশ জানিয়েছে, মারফিনের মতো এইরকম নিয়ন্ত্রিত ওষুধ সর্বোচ্চ পরিমাণেই তাদের দেশে ব্যবহৃত হয়। যেখানে উন্নয়নশীল দেশগুলির অধিকাংশই বলছে, যে তাদের দেশে এজাতীয় ওষুধের ব্যবহার খুবই কম। হু'র সাম্প্রতিকতম প্রতিবেদন— 'ওয়ার্ল্ড মেডিসিনস সিচুয়েশন ২০১ : অ্যাকসেস টু কন্ট্রোল্ড মেডিসিনস'-এ উল্লেখ করা হয়েছে—''বিভিন্ন রোগের কারণে যন্ত্রণার ভাগীদার কোটি কোটি মানুষ পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির কারণে তাঁদের রোগের ঠিকমতো চিকিৎসা করাতে পারেন না, তাঁরা আপাতভাবে ব্যথা নিরাময়ের দিকেই বেশি ঝুঁকছেন''। রিপোর্টে এও বলা হয়েছে, '৯০-এর দশকে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত ওষুধ ব্যবহারে নিয়মবিধি শিথিল করায় এবং নতুন লাইসেন্স বিধি চালু করায় ওষুধের দোকানদারের মৌখিকভাবে করা পেন-কিলারের প্রেসক্রিপশনেই মানুষ কাজ চালিয়ে নিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। যা মানব-স্বাস্থ্য হানিকর বলে বিবেচিত হয়েছে।

লেখকদের প্রতি

যে কোনওরকম লেখা, সে চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন তা কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন রেখে না হলে কোন মতেই ছাপার জন্য বিবেচিত হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হয় না। কোনও লেখারই ফটো কপি গ্রাহ্য হবে না।

চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের ওপর ''চিঠিপত্র'' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। এতে খুব তাড়াতাড়ি চিঠিটি একেবারে চিঠিপত্র বিভাগে গিয়ে পৌঁছায়।

চিঠিপত্র বা সংবাদ সামগ্রী যাই পাঠানো হোক না কেন তাতে প্রেরকের পুরো নাম-ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার (যদি থাকে) থাকা দরকার। না থাকলে তা ছাপা হবে না।

— সঃ স্বঃ

এজেন্টদের জন্য

অন্তত পাঁচ কপির কম স্বস্তিকার এজেন্সী দেওয়া হয় না। প্রতি কপি স্বস্তিকার জন্য ২০.০০ টাকা করে অগ্রিম জমা অবশ্যই রাখতে হবে।

প্রতি মাসের বিলের পাওনা টাকা অবশ্যই পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করা প্রয়োজন। অন্যথায় এজেন্সী বাতিল হতে পারে।

স্বস্তিকা ডাক, রেল ও সড়ক পরিবহন দ্বারা পাঠানোর ব্যবস্থা আছে। ২৫ কপির কম পত্রিকা রেল বা সড়ক পরিবহন সংস্থার মাধ্যমে পাঠানো হবে না। রেল বা সড়ক পরিবহন সংস্থার মাধ্যমে পত্রিকা নিতে ইচ্ছুক এজেন্টকে নিকটবর্তী রেল স্টেশনের নাম বা পরিবহন সংস্থার নাম, ঠিকানা (পিন সহ) এবং ফোন নম্বর (যদি থাকে) জানাতে হবে।

নতুন এজেন্ট হলে অগ্রিম জমা টাকা সমেত সম্পূর্ণ নাম ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার।

আরও বিস্তারিত জানতে স্বস্তিকা দপ্তরে পত্রালাপ করুন। মুদ্রিত অফিসের মোবাইলে ফোন করতে পারেন।

— ব্যবস্থাপক

চিঠিপত্র

সততার প্রতীক

গত ২০০১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বে তহলকা কাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে তৃণমূলনেত্রীর রেলমন্ত্রীত্ব ত্যাগ ও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর তাঁর বাড়ীতে আগমন আজকে ইতিহাস। সেই সময় তাঁর যুক্তি ছিল তহলকা কাণ্ডে যে তথ্য উঠে এসেছে তা তাঁর সৎ ভাবমূর্তিকে কলুষিত করবে। তাই অভিযুক্তদের সংসর্গে তিনি থাকবেন না। এরপর গঙ্গায় অনেক জল বয়ে গেছে। ২০০৬ এর ভাটার পর তৃণমূলের গাঙে এখন ভরা জোয়ার। ১৯ জন সাংসদ নিয়ে তৃণমূল এখন দ্বিতীয় ইউ পি এ-র দ্বিতীয় বৃহত্তম দল। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তিতে আজ আবার তৃণমূলেশ্বরী রেলমন্ত্রী। কিন্তু প্রতিদিনই কমনওয়েলথ, আদর্শ আবাসন, টু-জি স্পেকট্রাম, এস ব্যান্ড প্রভৃতি হেভিওয়েট দুর্নীতি তাঁর সহযোগী দলের বিরুদ্ধে উঠে এলেও এখন তাঁর ইমেজে কোনও প্রভাব পড়ে না। এখন তাঁর এই অসাধু সংসর্গেও কোনও আপত্তি নেই। যৌথ-বাহিনী নিয়ে তিনি সর্বদা সরব হলেও সংসদে তাদেরই লেজুড় হয়ে আছেন, তাঁর সেই ছুৎমার্গ এখন নেই, তার কারণ বোধহয় একটাই। দিদির করিৎকর্মা ভাইয়েরা সমস্ত মোড়ে দিদির ছবির নীচে লিখে দিয়েছে 'সততার প্রতীক'। তাই দুর্নীতিবাজ দলের সঙ্গে থাকতে আজ দিদির আর কোনও ভয় নেই। সঙ্গে 'সততার প্রতীক' মাদুলি আছে যে!

প্রকৃতপক্ষে মমতা সর্বদাই মুসলিম ভোটভিক্ষু। তাই ঠুনকো অভিযোগে বিজেপি-কে ছাড়তে তিনি মরিয়া ছিলেন। কিন্তু আজ তিনি এতটাই ক্ষমতালোভী হয়ে উঠেছেন যে রেলকে হাতিয়ার করে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নে 'আমিও পারি' দেখাতে তিনি মত্ত। সেই মত্ততার কারণেই তাঁর এতদিনের মূল্যবোধ আজ তাঁর কাছে 'রাজনৈতিক চেতনার অভাব' বলে পরিগণিত। চূড়ান্ত ক্ষমতালিপ্সার জন্যই আজ তিনি আর অন্তরাত্মার ডাক শুনতে পান না। চরম দুর্নীতিবাজদের সঙ্গে তাঁর হাতমেলাতেও একটু বাধা নেই।

—**রাজু হালদার, জামালপুর, বর্ধমান।**

'পরিচ্ছন্ন' প্রধানমন্ত্রী

মনমোহন-সোনিয়া তথা ইউ পি এ সরকারের দুর্নীতির দ্বিতীয় ইনিংস চলছে। সম্প্রতি কথাটা বলেছেন বিজেপি সভাপতি নীতিন গডকড়ি! ২-জি স্পেকট্রাম ঘোটালা ফাঁস হয়েছিল প্রথম ইনিংসের ২০০৮ সালে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী এ রাজা বারবার বলেছে যে পি এম ও অফিস ও প্রধানমন্ত্রী সব জানতেন। তবুও ২০০৮ সালের ১.৬০ হাজার কোটি টাকার দুর্নীতির পাপ চেপে গিয়ে, দ্বিতীয়বার নির্বাচনে জিতে এসেও চাপা দেওয়া গেল না। যুক্ত হলো কমলওয়েলথ, আদর্শ আবাসন, সি ভি সি নিয়োগসহ নানা দুর্নীতি। বিজেপিসহ বিরোধীদের চাপে, সুপ্রীম কোর্টের তিরস্কারের পরও লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে কলের পুতুল প্রধানমন্ত্রী কখনও ভুল স্বীকার, কখনও বা না-জানার ভান করে অনন্য নজির সৃষ্টি করেছেন। গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো উইকিলিক্স ফাঁস করেছে অর্থ উৎকোচ দিয়ে এম পি কিনে সরকার টিকিয়ে রাখার ঘৃণ্য কৃতকর্ম। মিঃ ক্লিন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেলেন তাতে করে কোনও সৎ লোক কোনও মন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী হতে চাইবে বলে মনে হয় না। তবে প্রত্যেক ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া আছে বলেই হঠাৎই আবির্ভূত হলেন গান্ধীবাদী মানবাধিকার নেতা আন্না হাজারে। তিনি দিল্লীতে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করলেন। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সমর্থন দেখে লোকপাল বিলের সমস্ত দাবী সরকার মেনে নিতে বাধ্য হলো। অথচ বিরোধীদের চাপে সরকার জেপিসি গঠন করতেও চায়নি প্রথমে। শ্রীহাজারে বলেছেন, লোকপাল বিল যদি কোনওভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয় তবে পুনরায় আন্দোলন তীব্রভাবে সংগঠিত হবে। হবে জেল ভরো আন্দোলন। তিনি নরেন্দ্র মোদী ও নীতিশ কুমারের প্রশংসা করে বললেন সব সরকারকে তাদের অনুসরণ করতে। সুতরাং খেলা এবার জমে উঠেছে। বিজেপি-ও এই আন্দোলনে সমর্থন জানিয়েছে। ভারতের গণতন্ত্রে আমেরিকা বা ইংলন্ডের মতো দুটি দল থাকা বাঞ্ছনীয়। তবে পরিবারতন্ত্রী দল কখনই গ্রহণযোগ্য নয়। বর্তমান ইউ পি এ তথা কংগ্রেস সরকার শুধু ব্যর্থই নয়, দুর্নীতি ও স্বজন পোষণের ওয়ার্কশপ। মনমোহন সিং কেয়ার টেকার প্রধানমন্ত্রী, The King of dark Chamber.

—**বৈদ্যনাথ ঘোষ, বারাসাত, উঃ ২৪ পরগনা।**

নরক যন্ত্রণার ৬ বছর

গত ১২ এপ্রিল, ২০১১, মেদিনীপুর শহরের বিদ্যাসাগর হলে একঘণ্টার তথ্যচিত্র প্রদর্শনী হলো, যা কিনা সদ্য আত্মসমর্পণকারী মাওবাদী সদস্যা শোভা মান্ডির মাওবাদীদের সঙ্গে কাটানো ৬ বছরের অভিজ্ঞতার একটি জীবন্ত দলিল। গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সঙ্ঘ মেদিনীপুর পশ্চিম জেলার প্রযোজনায় অরুণাভ গাঙ্গুলীর পরিচালনায় শালবণি, লালগড়ের জঙ্গলে দেড়মাস ধরে শুটিং করে এই তথ্যচিত্রটি তৈরি—যার নায়িকা আত্মসমর্পণকারী মাওবাদী নেত্রী শোভা মান্ডি। পুলিসের তাড়া খেয়ে এক ক্যাম্প থেকে আরেক ক্যাম্পে পালানো, জোড়া জোড়া চোখের সতর্ক নজরের মধ্যে পালাতে না পারা, রাত হলে কোনও মাওবাদী নেতার সাহচর্য দিতে বাধ্য হওয়া, বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য হওয়া ছিল শোভা মান্ডির জীবন। কোনওদিন পালাতে গিয়ে তপ্ত সীসার বুলেট শরীরে প্রবেশ করবে—এই অবশ্যম্ভাবী পরিণতির কথা ভেবেও বাঁচার স্বপ্ন দেখত শোভা। তাই প্রহরীদের সতর্ক নজর এড়িয়ে একদিন শোভা জঙ্গলজীবন থেকে বেরিয়ে এসে পুলিসের কাছে আত্মসমর্পণ করে। এখন সরকারী পুনর্বাসন কেন্দ্রে শোভা পড়াশুনারত। তার মতো ক্যাডারদের দলীয় মিটিং-এ মত প্রকাশ করতে চাইলে ধমকে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে—দলীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গেলে মৃত্যুই যে অনিবার্য পরিণতি সেকথাও স্মরণ করিয়ে দেওয়া চিত্রে দেখানো হচ্ছে। চরম দারিদ্র্যের কবলে পড়ে, হতাশা ও বঞ্চনার শিকার জঙ্গলমহলের যুবক যুবতীরা সমাজ বদলের স্বপ্ন নিয়ে বাড়ী ত্যাগ করে মাওবাদীদের খপ্পরে পড়ছে। খুন, তোলাবাজি, বে-আইনী অস্ত্র ব্যবসায় মদত, উন্নয়নের অর্থ আত্মসাৎ করার মধ্য দিয়ে যে মাওবাদী আন্দোলনের রমরমা, তা ইতিপূর্বে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে সবাই কিছু কিছু জেনেছেন। তবুও সত্তরের দশক থেকে সৌখিন শিক্ষিত কিছু মানুষ এর মধ্যেও সমাজ বদলের স্বপ্ন দেখে শহরাঞ্চলে এদের আশ্রয় ও আইনী সাহায্যের ব্যবস্থা করছেন, তাদের এই ছবি দেখা প্রয়োজন। ছবিটি জঙ্গলমহলে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রদর্শিত হলে মাওবাদে আকৃষ্ট মানুষেরা আর একবার ভাববার সুযোগ পাবেন। আগামী নির্বাচনে জয়ী সরকার যৌথবাহিনী রেখে দ্রুত সরকারী থেমে থাকা প্রকল্পগুলি চালু করে মানুষকে সমাজের মূলস্রোতে সামিল করায় ব্রতী হওয়া উচিত। নচেৎ সরকার পরিবর্তন হলেও এই দীর্ঘ পোষিত মাওবাদী সমস্যার সমাধান দূর অস্ত।

—**ভোলানাথ নন্দী, মাণিকপুর, মেদিনীপুর।**

কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেসের স্পেকুলেশন

অমলেশ মিশ্র

বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টে একটি গল্প আছে—হাউ মেনি টাইমস্ এ ম্যান সুড ফরগিভ হিজ ব্রাদার—একজন লোক কতবার তার ভাইকে ক্ষমা করবে? যীশু এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন সেভেনটি টাইমস্ সেভেন—৭ এর ৭০ গুণ বার অর্থাৎ ৪৯০ বার। এখানে ৪৯০ সংখ্যাটি গুরুত্বপূর্ণ নয়—গুরুত্বপূর্ণ হল, যীশু অসংখ্যবার ক্ষমা করার উপদেশ দিয়েছিলেন।

কিন্তু এক ভাই আর এক ভাইয়ের জন্য বা এক বোন আর এক বোনের জন্য কতদিন অপেক্ষা করবে—নিউ টেস্টামেন্টে সে বিষয়ে কোন গল্প নই। তবে ইংরাজীতে প্রবাদ আছে—বেটার লেট দ্যান নেভার। অর্থাৎ একদম না হওয়ার থেকে দেরীতে হওয়া ভাল। বাংলায় বলে—সবুরে মেওয়া ফলে। অর্থাৎ অপেক্ষা করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। সময় মেনে চলা মানুষেরা বলেন, আমার মেওয়া দরকার নাই, আমি সবুর করব না—বেটার লেট দ্যান নেভার। বিলম্ব হওয়ার থেকে, না হওয়া বরং ভাল।

রাজনীতিতে স্পেকুলেশনের একটা বিশেষ মূল্য আছে—শেয়ার বাজারের স্পেকুলেশনের মতো। স্পেকুলেশনটি ইংরাজী শব্দ। বাংলা করলে দাঁড়ায়—ভবিষ্যত সম্ভাবনা সম্পর্কে অনুমান। বর্তমানে এই পরিস্থিতি আছে—ভবিষ্যতে এই পরিস্থিতি হতে পারে। অতএব বর্তমানের এই পরিস্থিতির উপরে ভিত করে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে অনুমান।

সিপিএম তথা বামফ্রন্টের স্পেকুলেশন হল—২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর বাম-বিরোধীদের সরকার গঠনের সম্ভাবনা এক শতাংশও নাই। অপরদিকে স্পেকুলেশন হল মমতা

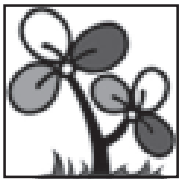

বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। কোনও পক্ষের স্পেকুলেশন ঠিক তা আমরা এখনই বলতে পারব না। আমাদের উপরের তলায় বর্তমান প্রতিদিন যাঁরা আনন্দ করছেন তাঁরা স্পেকুলেট করে নিচ্ছেন। তাঁদের পক্ষে কাজটা সহজ হয়েছে কারণ এই স্পেকুলেশনের উপর তাঁদের বর্তমান প্রতিদিন আনন্দ নির্ভর করছে।

আমরা শুধু ভাবছি কোন স্পেকুলেশনে কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেসের জোটটা আটকে থাকছে। তৃণমূল বলতে চায়—বেটার দ্যান লেট নেভার। বাইবেলে অপেক্ষা করার বিষয়ে কোন গল্প নেই। বরং সংস্কৃততে বলে---শুভস্য শীঘ্রম্—শুভ কাজ শীঘ্র কর। আরবীতে বলে—অল অজ্‌লু মীনা শয়তানে—দেরী করা ভাল নয়। কোন স্পেকুলেশনে তৃণমূল এতটাই নিশ্চিত যে তারা দুই-তৃতীয়াংশ বিধায়ক নিয়ে সরকার গড়বে এবং তা এই ২৩০টি আসনে প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পরেই বলা হল। মোট আসন সংখ্যা ২৯৪। তার দুই তৃতীয়াংশ মানে ১৯৬। অর্থাৎ কংগ্রেসের সঙ্গে জোট না হলেও তৃণমূলের সরকার গঠনে কোনও সংশয় নাই। প্রশ্ন হল—তৃণমূল নিজেই তো এই গরিষ্ঠতা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছে যখন ঘোষণা করেছে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচনে এখন দাঁড়াচ্ছেন না। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর ছয় মাসের মধ্যে কোন বিধানসভা ক্ষেত্র থেকে নির্বাচিত হয়ে নেবেন। কংগ্রেসই বা কী কারণে এত টালবাহানা করছে? কংগ্রেসেরই বা স্পেকুলেশন কী? কংগ্রেস নিশ্চিত যে বামফ্রন্ট হারবে। কংগ্রেস নিশ্চিত যে মমতা দেবী মুখ্যমন্ত্রী হবেন। কংগ্রেস চাইছে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতার মধ্যে কংগ্রেসের সংখ্যাটা ঢুকিয়ে দিতে। অর্থাৎ তৃণমূল যেন নিজের শক্তিতে ১৪৮ না হয়। ১৪৬ হোক কিন্তু ১৪৮ যেন না হয়। তাই দর কষাকষি করে এমন কয়েকটি আসন পাওয়া যাতে বর্তমান তাদের বিধায়ক সংখ্যা ১৯ থেকে বেড়ে যেন ৩০ হয়। এবং সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে ফ্যাক্টর হতে পারে। রাজ্য কংগ্রেস বিলক্ষণ জানে যে, সনিয়া, প্রণব, মনমোহন ব্যতীত কংগ্রেসের আর কারুর সঙ্গে কোন আলোচনায় বসা মমতা বিলো ডিগনিটি বলে মনে করেন। রাজ্য কংগ্রেসের কেউই তাঁর সঙ্গে আলোচনা করার যোগ্য নন। এ মনোভাব যখন তিনি বিজেপির সঙ্গে জোটে ছিলেন তখনও দেখা গেছে। এটা ভাল অথবা মন্দ সে বিষয়ে মন্তব্য না করেও কংগ্রেস স্পেকুলেট করছে যে আঁতাত করলে তারা ৩০টি আসন পেয়ে ফ্যাক্টর হতে পারে।

তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য কংগ্রেস সম্পর্কে মনোভাব দুটো ক্ষেত্র পরিষ্কার জানা গেছে। আগের কোনও বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গে আসন সমঝোতা করার পর নির্বাচনের পরে তৃণমূল অভিযোগ করেছিল যে কংগ্রেস বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। দ্বিতীয় উদাহরণ হল—সবং-এ (কংগ্রেস সভাপতি মানস ভুঁইয়ার আসন) গিয়ে সভা করে—মানসবাবু সম্পর্কে নানারকম উক্তি।

তৃণমূলের স্পেকুলেশন হল---কলকাতা পুরসভা নির্বাচনের মতো কংগ্রেসকে বাদ দিয়েই তারা দুই তৃতীয়াংশ আসনে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করবে (প্রশ্ন---মমতা দাঁড়ালেন না কেন?)। কংগ্রেসের স্পেকুলেশন হলো যেভাবেই হোক বিধানসভায় ৩০টি আসনে জয়ী হয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার শরিক হওয়া।

রামকৃষ্ণ কেল্লায় ঝড়ের পূর্বাভাষ

পরম্পরা

অর্ণব নাগ

ঝড় আর ভূমিকম্প—আপাতদৃষ্টিতে এদের কোনও সাযুজ্য থাকার কথা নয়। তবু ছিল সেইদিন অর্থাৎ ১২৯২-এর ৩১ আষাঢ়, ইং ১৪ জুলাই, ১৮৮৫ খৃস্টাব্দে। তিথি শুক্লা দ্বিতীয়া, রথযাত্রার দিন। ঠাকুর রয়েছেন তাঁর প্রিয়তম 'কেল্লায়'। অর্থাৎ রামকান্ত বসু স্ট্রীটের (এখন গিরীশ অ্যাভিনিউ) গুরুপ্রসাদ বসুর পৌত্র এবং রাধামোহন বসুর পুত্র পরমভক্ত বলরাম বসুর বাড়িতে। হুগলি জেলার আঁটপুর-তড়া গ্রামের এই বসুরা তখন কলকাতায় জাঁকিয়ে বসেছেন। রীতিমতো বনেদী পরিবার। ঠাকুরের এই পরমভক্তটির প্রপিতামহ কৃষ্ণরামও এলাকার একজন নামজাদা ব্যক্তি। নিদেনপক্ষে শতাধিকবার ঠাকুর এই বাড়িটিতে পদার্পণ করেছেন। মাস্টারমশাই (শ্রীম)-এর বিস্ময় প্রণিধানযোগ্য—''ধন্য বলরাম! তোমারি আলয় আজ ঠাকুরের প্রধান কর্মক্ষেত্র হইয়াছে। কত নূতন নূতন ভক্তকে আকর্ষণ করিয়া প্রেমডোরে বাঁধিলেন, ভক্তসঙ্গে কত নাচিলেন, গাইলেন। যেন শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাসমন্দিরে প্রেমের হাট বসাচ্ছেন।''

যাইহোক, সেই ঝড় আর ভূমিকম্পের মধ্যে এবার সাযুজ্য নির্ণয় করার সময় এসেছে। সেই রথযাত্রার দিন বলরাম বসুর 'রামকৃষ্ণ কেল্লা' থেকে সকাল সাড়ে ছ'টা নাগাদ গঙ্গাস্নানে যাচ্ছিলেন মাস্টারমশাই। পথে হঠাৎই ভূমিকম্প। ঠাকুর কেমন আছেন চিন্তা করে তৎক্ষণাৎ প্রত্যাবর্তন করলেন তিনি। এসে দেখলেন—''ঠাকুর বৈঠকখানা ঘরে দাঁড়াইয়া আছেন। ভক্তেরাও দাঁড়াইয়া আছেন। ভূমিকম্পের কথা হইতেছে। কম্প কিছু বেশি হইয়াছিল। ভক্তেরা অনেকে ভয় পাইয়াছেন।'' ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে মাস্টারমশাই বললেন, ''আমাদের সব নিচে যাওয়া উচিৎ ছিল।'' ঠাকুরের প্রত্যুত্তর—'যে ঘরে বাস, তারই এই দশা! এতে আবার লোকের অহংকার। তোমার আশ্বিনের ঝড়ের কথা মনে আছে।' এক লহমায় ২১ বছর আগে ফিরে গেলেন মাস্টারমশাই। ১৮৬৪-এর আশ্বিনের ঝড়। যে ঝড়ের অভিঘাতে ওই সময় তিনি ব্যাকুল হয়ে কেঁদে একাকী ঘরে বসে ঈশ্বরকে ডেকেছিলেন। মাস্টারমশাই-এর কিঞ্চিৎ সংশয়, অন্তর্যামী ঠাকুর কি তাঁকে সবকিছু মনে করিয়ে দিচ্ছেন?

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব একবার শ্রীশ্রীমা-কে অদ্ভুত একটা কথা বলেছিলেন, ''যখন

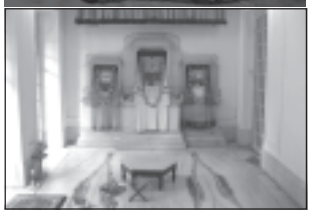

বলরাম মন্দির

যাহার তাহার হস্তে ভোজন করিব, কলকাতায় রাত্রিযাপন করিব এবং খাদ্যের অগ্রভাগ কাহাকেও প্রদান করিয়া অবশিষ্টাংশ স্বয়ং গ্রহণ করিব, তখন জানিবে দেহরক্ষা করিবার অধিক বিলম্ব নাই।'' সিম্পটমগুলো সব মিলে যাচ্ছে। পিতৃহারা নরেন্দ্রনাথকে তাঁর জন্য শ্রীশ্রী মায়ের রান্না করা ঝোল-ভাতের অগ্রভাগ দিয়ে তিনি খাইয়ে দিচ্ছেন। গলায় ক্যান্সার রোগ ধরা পড়েছে। চিকিৎসার কারণে কলকাতায় আসতে বাধ্য হয়েছেন। প্রথমে তাঁকে বাগবাজারে দুর্গাচরণ মুখার্জী স্ট্রীটের একটি ছোট বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ''কিন্তু ভাগীরথীতীরে কালীবাটীর (দক্ষিণেশ্বর) প্রশস্ত উদ্যানের মুক্ত বায়ুতে থাকিতে অভ্যস্ত ঠাকুর ওই স্বল্পপরিসর বাটীতে প্রবেশ করিয়াই ওই স্থানে বাস করিতে পারিবেন না বলিয়া তৎক্ষণাৎ পদব্রজে রামকান্ত বসুর স্ট্রীটে বলরাম বসুর ভবনে চালিয়া আসিলেন।'' (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ দ্বিতীয় খণ্ড)

এবাড়ি তাঁর অতিপরিচিত, একান্ত আপন, তাঁর 'কেল্লা'। ইতিপূর্বে অসংখ্যবার এখানে এসে, মাঝে মাঝে রাতও কাটিয়ে গিয়েছেন তিনি। 'ভক্তসঙ্গে মিলন, বলরামের শুদ্ধ অন্নগ্রহণ, রথযাত্রা উৎসবে সংকীর্তন, বিভিন্ন সময় ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ, ভাবাবেশে ভক্তদের প্রতি কৃপা, সমাধি প্রভৃতি শ্রীশ্রী ঠাকুরের বহুলীলা এই বাড়িতেই প্রকটিত হইয়াছিল।' (স্থান পরিচয়, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, অখণ্ড সংস্করণ)। 'প্রাক্-অন্ত্যলীলা' পর্বে এখানে তাঁর উপস্থিতি ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর, ১৮৮৫ খৃস্টাব্দ অবধি। মাত্র সাতদিনের সেই উপস্থিতিই কী বাঙ্ময়। তাঁর 'অন্ত্যলীলা' পর্বের দু'টি লীলাক্ষেত্র 'শ্যামপুকুর বাটী' এবং 'কাশীপুর উদ্যানবাটী'র তুলনায় এতো নেহাতই তুচ্ছ। কিন্তু বিষাদ-মূর্চ্ছনার করুণ রাগিণীর মধ্যেও আনন্দরূপ রামকৃষ্ণকে দেখার দুর্লভ সাক্ষী এই বাড়ি। এই বাড়ির বারান্দায় তাঁর রথযাত্রার দিনগুলোয় রথ-টানা, সেইসঙ্গে ভক্তসঙ্গে নাম-গুণকীর্তন বিশেষত ১৮৮৫-এর রথের দিনে আনন্দময় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের বিরলতম মুহূর্তগুলির মধ্যে অন্যতম।

শুধু তাই নয়, ঠাকুরের লীলাবসানের পরেও, এই বাড়িতে ঠাকুরের পদচিহ্নের উপস্থিতি প্রতিটি পদক্ষেপে। ১৮৯৭ সালের ১ মে, আমেরিকা প্রত্যাগত, বিশ্বজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর গুরুর নামাঙ্কিত বহু স্বপ্নের, বহু সাধনার, বহু আরাধনার 'রামকৃষ্ণ মিশনে'র প্রতিষ্ঠা করেন এখানেই। 'শতাধিকবার ঠাকুরের শুভাগমন ছাড়াও এই বাড়িটি শ্রীশ্রী মা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী অদ্ভুতানন্দ প্রমুখ পার্ষদগণের বিভিন্ন সময়ে অবস্থান এবং পরবর্তীকালে এখানে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী প্রেমানন্দের (বাবুরাম মহারাজ, বলরামের শ্যালক) দেহরক্ষা প্রভৃতি স্মৃতিতে বাড়িটি ঠাকুরের অনুরাগীদের কাছে পবিত্র সম্পদরূপে গণ্য। এই বাড়িতেই পরম ভাগ্যবান বলরাম বসুও ১৮৯০ সালে দেহত্যাগ করেন।' ('চরণ চিহ্ন ধরে'— নির্মল কুমার রায়)।

হাটে হাঁড়ি ভাঙা স্রেফ সময়ের অপেক্ষা। ঠাকুরের কলকাতা আগমন সমাজে ঝড় তুলে দিয়েছে। এর কাছে আশ্বিনের ঝড়কেও নেহাতই স্নিগ্ধ মলয় সমীরণ বলে মনে হচ্ছে। ঝড় থামলে প্রকৃতি সাজবে। ১৮৮৬, ১ জানুয়ারি— ঝড়ের নাম কল্পতরু রামকৃষ্ণ, হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেওয়া ঠাকুর। ১৮৯৩, ২৯ সেপ্টেম্বর— চিকাগো ধর্মমহাসভায় বিশ্ববাসী হৃদয় জয় করা স্বামী বিবেকানন্দ। প্রকৃতির সজ্জা সম্পূর্ণ। ১৮৮৫, সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে এই মহাঝড়ের পূর্বাভাস। সাক্ষী থাকল কলকাতা, বলরাম বসুর বাসভবন।

মহাবলীপুরম্ : ইতিহাস এখানে ফিরে ফিরে আসে

অভিরূপ শর্মা

চেন্নাই থেকে ঠিক ৬০ কিলোমিটার দক্ষিণে। সমুদ্রের উপকূল বরাবর চলে গিয়েছে গিয়েছে সুদৃশ্য রাস্তা। তামিলনাড়ু স্টেট ট্রান্সপোর্টের বিশেষ বাস কিংবা ট্যাক্সি অনবরত চোখে পড়বে। একটানা সমুদ্রের দিকে তাকালে তার নীল রঙ আপনার আঁখি-পল্লবে তৈরি করে দেবে এক মায়াজাল। ঝাপসা চোখ খুঁজে বেরাবে সপ্তম শতাব্দীর ইতিহাসকে। যে ইতিহাসের উপাদান অজস্র পাথুরে মন্দির, ভাস্কর্য এবং এরই পটভূমিতে প্রোথিত বিশ্বের বৃহত্তম প্রস্তর খণ্ড। এর নাম মহাবলীপুরম বা মাল্লাপুরুম। যেখানে ইতিহাসেরও একটা ইতিহাস রয়েছে। সপ্তম শতাব্দীতে এখানেই ছিল স্বনামধন্য পল্লব রাজাদের রাজত্ব। সেখানে তখন কান পাতলে শোনা যেত প্রাচীন ঐশ্বর্যময় ভারতবর্ষের গৌরবগাথা। মহাভারতের 'অর্জুনের প্রায়শ্চিত্ত'-এর স্থান এটিই। ভগীরথ স্বর্গ থেকে মর্ত্যের এখানেই নাকি প্রথম গঙ্গাকে এনেছিলেন। আজও বর্ষার সময় সমুদ্রের ধার দিয়ে স্রোতস্বিনী প্রবাহ স্মরণ করিয়ে দেয় সেকথা। সমুদ্রের পাশেই বর্ষার সময় তৈরি হয়ে যাওয়া ছোট্ট নদী সমুদ্রকেই যেন মূর্ত করে তোলে।

অবশ্য মহাবলীপুরমের নাম শুনে রামায়ণের বালি-র সঙ্গে এর সাযুজ্য খুঁজতে যাওয়ার চেষ্টা করবেন না। এই নামটি এসেছে মামাল্লা থেকে। বিখ্যাত পল্লব রাজা প্রথম নরসিংহবর্মনের পদবী হলো এই মামাল্লা। একথা অনস্বীকার্য যে পল্লবরাজাদের অবদানেই আজকের মাল্লাপুরমের ট্যুরিস্ট আকর্ষক সৌধগুলো গড়ে উঠেছে। তৃতীয় শতকে পল্লবরাজারাই সম্ভবত প্রথম ভারতবর্ষের একটি অঙ্গরাজ্যে তাদের সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। কাঞ্চি ছিল তাদের রাজধানী। মহাবলীপুরম তার সমুদ্র দিয়ে পল্লবরাজাদের সঙ্গে বহির্বিশ্বের যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিল। আর রাজ্যকে দিয়েছিল অঢেল প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদ।

প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান আর ইতিহাস মাল্লাপুরমে হাত ধরাধরি করে হাঁটে। পাথরের গায়ে খোদাই করা কবিতা কিংবা গুহাগাত্রে অনবদ্য ভাস্কর্য বারবার এর সমৃদ্ধ অতীতের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এর মধ্যে কৃষ্ণের অনেকগুলি ভাস্কর্য যেমন, গো-পালক, দাদা বলরামের সঙ্গে কিংবা সখা-পরিবৃত অবস্থায় কৃষ্ণ বা গোপালের চিত্র সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ব্রজভূমির কিছু চিরন্তন দৃশ্যাবলী যেমন গরু দুধ দিচ্ছে, পটে আঁকা গোপী, কুঠার হাতে কাঠুরে ইত্যাদিও এখানে দুর্লভ নয়, ভাস্কর্যের খাতিরে। তবে এখানকার সবচেয়ে দর্শনীয় জিনিস হলো মহিষাসুরমর্দিনী গুহার কাছে পাঁচটি রথাকৃতি মন্দির। পঞ্চ-পাণ্ডব এবং দ্রৌপদী-র নামে মন্দিরগুলির নামকরণ করা হয়েছে। এর সামনেই আবার রয়েছে হাতির একশিলা স্তম্ভ। ইতিহাস এভাবেই ফিরে ফিরে আসে এখানে।

মাল্লাপুরমকে ঐতিহাসিক মিলনস্থলও বলতে পারেন। সরু এবং লম্বাটে দু'টি স্তম্ভ বার্মীজ প্যাগোডা (বৌদ্ধদের উপাসনাস্থল)-কে স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে এই প্যাগোডা-র স্বাতন্ত্র্য অন্যান্য প্যাগোডা-র চাইতে অনেক বেশি। দু'টি প্যাগাডা-র একটিতে উপাস্য জগৎ-পালনকারী বিষ্ণু, অপরটিতে তাণ্ডবলীলার (ধ্বংসাত্মক) শিবঠাকুর—নটরাজ।

শতবর্ষ পূর্তিতে

স্বাধীনতা সংগ্রামী বীরাঙ্গনা প্রীতিলতা

ইন্দিরা রায়

উনিশ শতকের চারের দশকে ভারত জুড়ে চলছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের জনজোয়ার। অবিভক্ত বাংলার চট্টগ্রাম ছিল বিপ্লবীদের অন্যতম ঘাঁটি। সদ্য যুবার দল প্রাণের মায়া ত্যাগ করে নেমে পড়েছিল দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনে। কিন্তু ওই সময়ে কিছু মহিলার অন্তরে ছিল আগুন। তাঁদের মধ্যে অন্যতমা প্রীতিলতা—সংগ্রামী হিসাবে যিনি পরবর্তীকালে সক্রিয় বৃটিশ-বিরোধী হয়ে ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিয়েছেন। ২০১১-র মে মাসে তাঁর শতবর্ষ পূর্ণ হচ্ছে। তাঁর জীবনসংগ্রাম আজকের দিনে স্মরণযোগ্য। ১৯১১-র মে মাসে প্রীতিলতার জন্ম চট্টগ্রামে, আর এই চট্টগ্রামই তাঁর দেশ। সে সময়ে মেয়েদের পড়াশোনা করার প্রচলন তো ছিলই না, মেয়েদের স্থান ছিল সংসারে। তার বাইরে আসা ছিল স্পর্ধার কাজ। কিন্তু প্রীতিলতার পারিবারিক পরিবেশ ছিল ব্যতিক্রমী। তাঁর বাবা জগদ্বন্ধু ওয়াদেদ্দার কিন্তু মেয়েদের লেখাপড়া শেখার ব্যাপারে ছিলেন উৎসাহী। মা-ও ছিলেন এ ব্যাপারে উৎসাহী। তাই বাড়িতে দাদার মাস্টারমশায়ের কাছে লেখাপড়া শেখার পাঠ শুরু হয়ে যায় ছোটবয়সেই।

উত্তাল আন্দোলনের ছবি তাঁকে এই বয়সেই আলোড়িত করেছিল। হয়তো ব্যাপারটা বুঝে ওঠার জ্ঞান তখন ততটা হয়নি। ইতিমধ্যেই ঢাকায় লীলা নাগ পরিচালিত দীপালি সঙ্ঘ আর কলকাতায় কল্যাণী দাসের নেতৃত্বে 'ছাত্রীসঙ্ঘ' গড়ে উঠেছে। ক্রমে ক্রমে অগ্নিকন্যা প্রীতিলতা এঁদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে শুরু করেন; পাশাপাশি চলতে থাকে পড়াশোনা। ক্রমেই রাজনীতিক জীবনের সূত্রপাত ঘটতে থাকে এবং সেটা আরও বেশি উদ্দীপ্ত হয় বিপ্লবী পূর্ণেন্দু দস্তিদারের সাহচর্যে। এরপর আর অপেক্ষা নয়; একেবারে সরাসরি চট্টগ্রামের বিপ্লবী সূর্য সেনের দলে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েন। কলেজে পড়া সদ্য-তরুণী প্রীতিলতা পড়াশোনার পাশাপাশি গোপনে বিপ্লবাত্মক বইপত্র পড়তে শুরু করেন এবং ইংরেজিতে দৈনিক ডায়েরী লিখতেন নিয়মিত। তাঁর অন্তর্নিহিত সাহিত্য প্রতিভারও প্রকাশ দেখা গেছে বাংলায় লেখা নানা প্রবন্ধ, নাটকের মধ্যে। তাঁর বীরাঙ্গনা রূপটির ওপর শ্রীকৃষ্ণের বীর্যবান রূপ প্রভাবিত করেছিল।

বিপ্লবাত্মক কাজকর্মে জড়িত থেকেও প্রীতিলতা তাঁর গৌরবগুণে ১৯৩০-এ ঢাকা বোর্ড থেকে মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। বেথুন কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে পুরস্কৃত হন। সূর্য সেনের বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলন তখন চলছে একের পর এক। আর ১৯৩০-এই মাস্টারদার (সূর্যসেন) নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন হয়। এই সময়ে প্রীতিলতা বিপ্লবীদের গোপন খবর আদান-প্রদান করতেন এবং চট্টগ্রাম ও কলকাতার মধ্যে সংযোগ রক্ষা করতেন। মাস্টারদার দলে যোগদান করলেও মাস্টারদার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না হলেও মাস্টারদার নির্দেশে তিনি চাঁদপুরে পুলিশ ইন্সপেক্টরকে হত্যার অপরাধে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দী ফাঁসির আদেশপ্রাপ্ত রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করার নির্দেশ পান। রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখার জন্য তিনি পরিচয় দিয়েছিলেন তাঁর বোন বলে। তাহলে যোগাযোগটা সহজ হবে। নানা খবরাখবর আদানপ্রদান চলাকালীন একদিন গিয়ে শোনেন রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসি হয়ে গেছে। আকস্মিক এই ঘটনা তাঁকে মানসিকভাবে এতটাই দুর্বল করে দেয় যে জেলের গেটের সামনে পড়ে যান এবং অসুস্থ হয়ে পড়েন। সাময়িকভাবে তেজী প্রীতিলতা বিপ্লবাত্মক কাজে পড়াশোনায় অনুৎসাহিত হয়ে পড়েন। যাহোক, বছর খানেকের মধ্যে সম্ভবত ১৯৩২-এ চট্টগ্রামে ফিরে গিয়ে ওখানকার নন্দনকানন বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষয়িত্রীর পদে আসীন হন। প্রধান শিক্ষিকার জীবন চলাকালীন জানা যায়, চট্টগ্রামের ধলঘাট গ্রামে স্বর্গত বিপ্লবী নবীন চক্রবর্তীর বাড়িতে সূর্য সেন, নির্মল সেন ও অপূর্ব সেন আত্মগোপন করে আছেন। এই খবর পেয়েই আবার নতুন উদ্যমে পুরুষের ছদ্মবেশে মাস্টারদার সঙ্গে দেখা করতে যান। এটা আশ্চর্যের ঘটনা যে, দীর্ঘদিন সূর্য সেনের দলে থাকলেও এখানেই দু'জনের প্রথম সাক্ষাৎকার। এই বাড়িটি যে বিপ্লবীদের ঘাঁটি তা পুলিশের জানা ছিল। একদিন রাতে পুলিশ আক্রমণ করে বাড়িটি। সেই সময়ে এখানে ছিলেন সূর্য সেন, নির্মল সেন, অপূর্ব সেন ও প্রীতিলতা। পুলিশের পদশব্দে তাঁরা দোতালায় উঠে যান। পুলিশ ইন্সপেক্টর ক্যাপ্টেন ক্যামরনও দোতলায় উঠতেই দোতলায় লুকিয়ে থাকা নির্মল সেন তাঁকে গুলি করেন। সঙ্গে সঙ্গে আহত ক্যাপ্টেন নিচে পড়ে যান। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর বিপ্লবীরা অন্ধকারে নিঃশব্দে বেরিয়ে ধীরে ধীরে পূর্বদিকের গড় পার হয়ে ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে যেতে থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে গোর্খারা গুলি ছুঁড়তে থাকে। এই গুলিতে অপূর্ব সেন মারা যান। প্রীতিলতা ও মাস্টারদা কোনক্রমে পালিয়ে অন্য গ্রামে চলে যান। রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে নিয়মিত যাতায়াত করে যে লেখাটি তিনি লিখেছিলেন, সেটি মাস্টারদাকে দিয়েছিলেন, সেটা পুলিশের হাতে পড়ে। ফলে আর পালিয়ে থাকা সম্ভব হলো না। তাঁর বাড়িতেই পুলিশ সদলবলে এসে তল্লাসি চালায় এবং তিনি নজরবন্দী হন। কিন্তু দমবার পাত্র নয় প্রীতিলতা— বিপ্লবী কাজ তাঁকে করতেই হবে, তাই মাস্টারদার অনুমতি নিয়ে তিনি বাড়ি ছেড়ে ওঁর কাছে আত্মগোপন করে থাকেন। সেই সঙ্গে চলতে থাকে গ্রামে গ্রামে কাজ।

ভীত হবার পাত্রী নন প্রীতিলতা। আরও সক্রিয় হয়ে উঠলেন। সূর্য সেনের নির্দেশে একের পর এক কাজ করতে থাকেন। ১৯৩২-এ সেপ্টেম্বরে দশ-বারোজন কর্মীকে নিয়ে পাহাড়তলীর ইউরোপীয়ান ক্লাব সশস্ত্র আক্রমণ করেন, তাতে ক্লাবের একজনের মৃত্যু হয় এবং আহত হন কয়েকজন। বিপ্লবীরা এই কাজে সক্ষম হন এবং অক্ষত অবস্থায় ফিরে আসেন। কিন্তু সফলকামী হয়েও প্রীতিলতা ফিরে না এসে আত্মঘাতী হন অ্যাসিড খেয়ে। বয়স তখন মাত্র একুশ। নির্ভীক সাহসিনী কেন নিজেকে এভাবে শেষ করে দিলেন—সেটাই প্রশ্ন। তবে হ্যাঁ, তাঁর জীবনের রোমহর্ষক ঘটনাবলী এবং সাহসী পদক্ষেপ ও সাফল্য চিরকালীন হয়ে থাকবে নারীজগতে। প্রীতিলতা ওয়াদেদ্দারের জীবনে গর্ভধারিণী জননীর প্রতি ছিল অগাধ ভক্তি ও ভালোবাসা। তাঁর কাছে স্বদেশ মা ও নিজের মা ছিল সমার্থক।

সমাবেশ সমাচার

মালদাতে হনুমান জয়ন্তী

গত ১৬ থেকে ১৮ এপ্রিল মালদা শহরের দক্ষিণ বালুচরের শ্রীশ্রী মহাবীর মন্দিরে উদযাপিত হয়ে গেল শ্রীহনুমান জয়ন্তী মহোৎসব। প্রতিবছরের মতো এই বছরও শ্রী হনুমানজীর অভিষেক, ২৪ ঘণ্টাব্যাপী অখণ্ড রামায়ণ পাঠ এবং সোয়ামনি পূজন ও আরতি হয়। এই উপলক্ষে কয়েক হাজার ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। এবারেও শ্রী হনুমান জয়ন্তীর প্রধান আকর্ষণ ছিল ১০১ কেজি ওজনের দুটি লাড্ডুর ভোগ নিবেদন। বহু ভক্ত এই দুটি বিশাল আকারের লাড্ডু দেখতে ভীড় করেছিল। ১৮ এপ্রিল সন্ধ্যায় ১০০৮টি প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে দীপযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। উপস্থিত ভক্তদের শ্রীরামের ভজন কীর্তনের মাধ্যমে উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে। অনুষ্ঠান মহিলাদের উপস্থিত ছিল নজর কাড়ার মতো।

আগরতলায় রবীন্দ্রনাথের সার্ধশত জন্মবার্ষিকী

ডাঃ হেডগেওয়ার স্মারক সমিতি আগরতলার উদ্যোগে গত ৭ এপ্রিল স্থানীয় আগরতলা প্রেসক্লাবের মিলনায়তন হলে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও রাজ্যের বর্ষীয়ান সমাজ সেবক চিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী সভাপতিত্ব করেন। প্রধান অতিথি এবং প্রধান বক্তার আসন অলংকৃত করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ সরকার্যবাহ সুরেশরাও সোনী মহোদয়। গুরুদেব বিশ্বকবির জীবন ও কর্মের স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে ত্রিপুরার রাজ পরিবারের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের কথা আলোচনা করেন চিত্তরঞ্জনবাবু।

বিশেষ অতিথি হিসাবে সঙ্ঘের উত্তর পূর্বাঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক ডঃ কৃষ্ণগোপাল শর্মা বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র সঙ্গীত ও রবীন্দ্র নৃত্য পরিবেশন করেন কুন্তল কলই, মোনালিসা কলই, নিবেদিতা দেব এবং শ্রীজিতা দেববর্মন। স্বাগত ভাষণ দেন সম্পাদক হারাধন পাল।

উইমেন্স খৃস্টান কলেজে সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির

কলকাতার কালীঘাট উইমেন্স খৃস্টান কলেজে সংস্কৃত বিভাগের প্রয়াসে দশদিন ব্যাপী সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। গত ১ এপ্রিল শিবিরের উদ্বোধন কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষা ডঃ অজন্তা পাল ও সংস্কৃত ভারতীর কার্যকত্রী জেরিয়ার আর্য়ুবেদিক মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপিকা ডাঃ স্নেহলতা নস্কর। শিবিরের শিক্ষিকা প্রমিতা ভট্টাচার্যের পাঠন কৌশলে শিক্ষার্থী ছাত্রীরা সর্বত্র দশদিনে সংস্কৃত ভাষায় কথা বলা আয়ত্ত করে সকলের প্রশংসা লাভ করে। গত ১২ এপ্রিল সমাপন সমারোহে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন কলেজের অধ্যক্ষা ডঃ অজন্তা পাল ও সংস্কৃত ভারতীর প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক প্রণব নন্দ।

মহাকবি কালিদাস রচিত মেঘদূত কাব্যের স্বরচিত বাংলা আবৃত্তি পাঠ করেন কলেজের অধ্যাপিকা সোনালী বসু। শিক্ষার্থী ছাত্রীরা 'বলিবর্দ' নাটক প্রদর্শন করে দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করে। সংস্কৃত ভারতী সংগঠনের উদ্দেশ্য ও কার্য বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ডাঃ স্নেহলতা নস্কর। সমারোহ কার্যক্রমে বহু বিশিষ্ট সুধীজন উপস্থিত ছিলেন।

'সুরভারতী' ও 'মহানাম সেবকসঙ্ঘের' রামজন্মোৎসব

''সুরভারতী সংস্কৃত ইন্‌স্টিটিউট'' এবং মহানাম সেবক সঙ্ঘের যৌথ উদ্যোগে গত ১ বৈশাখ ১৪১৮, এবং ১৫ এপ্রিল ২০১১ রঘুনাথপুর ভি আই পি রোড-এর শ্রীশ্রীমহানাম অঙ্গনে সন্ধ্যায় 'রামজন্মোৎসব' ও ''নববর্ষ মহোৎসব'' সাড়ম্বর পালিত হলো। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন 'মহানাম সেবকসঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীমৎ উপাসক বন্ধু ব্রহ্মচারী। প্রধান অতিথি ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ কলেজের (নৈশ) প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ রতিকান্ত ত্রিপাঠী। নতুন বৎসরে মানুষের মধ্যে রামচন্দ্রের সত্যনিষ্ঠা, ত্যাগ, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রভৃতি সদ্‌গুণের অনুশীলন যাতে বৃদ্ধি পায় সকলেই তার প্রার্থনা করেন। অধ্যাপক শান্তিনাথ ঘোষ রচিত ও পরিচালিত সংস্কৃত নাটক ''ভক্তবিগ্রহম্'' তরণীসেনের জীবন অবলম্বনে সুরভারতীর শিল্পীরা শ্রুতিনাটকরূপে উপস্থাপন করেন।

শোক সংবাদ

পরলোকে কার্তিক চন্দ্র দে

উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে যারা পরিচিত করিয়েছিলেন তাদের অন্যতম কার্তিক চন্দ্র দে। বসিরহাট নগরের প্রথম নগর কার্যবাহ বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কার্তিকদা সব প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে সঙ্ঘের দায়িত্ব কাধে তুলে নিয়েছিলেন। তাঁর বাড়ীই ছিল সঙ্ঘের অঘোষিত কার্যালয়। গত ৮ এপ্রিল সকালে তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বৎসর। তিনি স্ত্রী, এক পুত্র, পুত্রবধু, কন্যা, জামাতা, নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

** *

গত ১৬ মার্চ বসিরহাট নগরের রাত্রি শাখা ও প্রভাত শাখার কার্যবাহ পবন চন্দ্র দাস পরলোকগমন করেছেন। ১৯৯০ সালে করসেবায় গিয়ে মীরজাপুর জেলে ১৭ দিন বন্দী ছিলেন। ১৯৯২ সালেও করসেবায় অংশগ্রহণ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বৎসর।

জনগণনার প্রাথমিক রিপোর্টেও কংগ্রেসী রাজনীতির ছায়া

এন সি দে

২০০১ থেকে ২০১১ অবধি দশ বছরের জনগণনার রিপোর্ট গত ৩১ মার্চ, ২০১১ ইউপিএ অর্থাৎ কংগ্রেস জোট সরকারের হাতে জমা পড়েছে। তবে এই রিপোর্ট পাক্কা রিপোর্ট নয়। প্রতিবারই যে রিপোর্ট দেওয়া হয় প্রথমে তাকে বলা হয় 'unadjusted figures', আর ফাইনাল রিপোর্টে দেওয়া figure-কে বলা হয় 'adjusted figure', আর এই figure-এই হয় সরকারী জারিজুরি। অর্থাৎ রাজনীতি। অনুসন্ধিৎসু পাঠকের নিশ্চয়ই মনে আছে যে ২০০১-এ জনগণনা রিপোর্ট তৈরি হয়েছিল বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ সরকারের আমলে। সেই রিপোর্টে ছিল unadjusted figures। সেই figure থেকে আমরা সমগ্র ভারতবর্ষকে চিনতে পেরেছিলাম কারণ যে ধর্মীয় গোষ্ঠী একদিন সংখ্যাগুরু হিন্দুপ্রাধান্য রাষ্ট্রে থাকতে অস্বীকার করেছিল, কোরান-নির্দেশিত দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে এ দেশকে দ্বি-খণ্ডিত করেছিল, সেই ধর্মীয় গোষ্ঠীর সংখ্যাতাত্ত্বিক অবস্থান সেই রিপোর্টে আমরা পেয়েছিলাম। তা থেকে জানতে পেরেছিলাম ১৯৯১ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত এই দশ বছরে দেশের জনসংখ্যা ৮৪ কোটি ৬০ লক্ষ থেকে বেড়ে হয়েছিল ১০২ কোটি। কিন্তু সংখ্যাবৃদ্ধির হারে হিন্দুরা সেই ১৯৫১ সাল থেকে ক্রমশই কমে আসছে। হিন্দুর সংখ্যা বেড়েছিল যেখানে ২০.৩ শতাংশ হারে, মুসলমানের সংখ্যা সেখানে বেড়েছিল ৩৬ শতাংশ হারে। ১৯৫১ সালে ভারতীয় ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলি (হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, জনজাতি, বনবাসী এবং উপজাতি) মিলিতভাবে ছিল ৮৭.২ শতাংশ, আর মুসলিমরা এককভাবেই ছিল ১০.৪ শতাংশ, গত ৫০ বছরে ভারতীয় ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলির হার ৮৪.২ শতাংশ (কমেছে), অথচ মুসলিম জনসংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৩.৪ শতাংশ। অতএব মুসলিম জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার বেড়েই চলেছে। ১৯৮১-৯১ দশকে হিন্দু জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ২৫.১ শতাংশ, ১৯৯১-২০০১ দশকে এই বৃদ্ধির হার কমে হয় ২০.৩ শতাংশ, সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম জনসংখ্যার হার বৃদ্ধি হয়েছে ৩৪.৫ শতাংশ (১৯৮১-৯১) থেকে ৩৬ শতাংশ (১৯৯১-২০০১)।

২০০১-এ জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই হার প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু-বিদ্বেষী তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা সেন্সাস কমিশনার অব ইন্ডিয়া জে. কে. বানতিয়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অভিযোগ মুসলিম সংখ্যাবৃদ্ধির হারকে তিনি কেন দেখালেন? এই বৃদ্ধি নাকি বাড়িয়ে দেখানো হয়েছে। ইতিমধ্যে ২০০৪ সালে কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ মুসলিম তোষণকারীদের গুরু কংগ্রেস সরকার। কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২০০১-এর adjusted figure প্রকাশিত হয়। এই adjusted figure-এ মুসলিম সংখ্যা বৃদ্ধির হার কমিয়ে দেখানো হয় ২৯.৩ শতাংশ, (৬.৭ শতাংশ কমানো হয়)। এই হলো আমাদের দেশের জনগণনা। দুর্নীতিগ্রস্ত কংগ্রেসের সবকিছুতেই রাজনীতি। ২০০১-এর ধর্মীয় পরিসংখ্যানে কংগ্রেসের চেপে যাওয়ার আর একটি কারণ ছিল উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলিতে খৃস্টান জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি প্রকাশ হয়ে যাওয়া। আসাম বাদে উত্তর-পূর্বের পাঁচটি রাজ্যে ১৯৯১-এ ৩৯ শতাংশ থেকে খৃস্টান সংখ্যা ২০০১-এ বেড়ে হয় ৪৫ শতাংশ; এর মধ্যে নাগাল্যান্ড ও মিজোরামে ১৯৮১-৯১ দশকেই খৃস্টান সংখ্যা হয়ে যায় পুরোপুরি ১০০ শতাংশ। অরুণাচল প্রদেশে দ্বিগুণ হয়ে গেছে। মণিপুরের সীমান্ত জেলাগুলো প্রায় খৃস্টান অধ্যুষিত হয়ে এসেছে। মেঘালয়েও খৃস্টান জনসংখ্যা প্রায় ৭০ শতাংশে পৌঁছেছিল ২০০১-এ।

এবারের জনগণনা রিপোর্টে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সামগ্রিক হার দেখানো হয়েছে। ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলির অবস্থান আলাদা আলাদা ভাবে দেখানো হয়নি। শুধু দেখানো হয়েছে সর্বমোট জনসংখ্যা হয়েছে ১২১ কোটি; ২০০১-এ ছিল ১০২ কোটি; বেড়েছে ১৯ কোটি। কিন্তু বৃদ্ধির হার ২১.৩০ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে ১৭.৬৪ শতাংশ। ১৯৯১-এ ছিল ২৩.৮৯ শতাংশ। কিন্তু দেখানো হয়নি এই সংখ্যা বৃদ্ধির হার কমাতে কোন্ ধর্মীয় গোষ্ঠীর অবদান বেশী। নিঃসন্দেহে এই অবদান হিন্দুদেরই। কারণ হিন্দুরাই জন্মনিয়ন্ত্রণে মনেপ্রাণে অংশগ্রহণ করেছে। বেশীরভাগ হিন্দুর ঘরে এখন এক সন্তান। বরং মুসলমানরা জন্মনিয়ন্ত্রণে বিরোধিতা করায় মুসলমানদের তুষ্ট করার জন্য জন্ম নিয়ন্ত্রণ কথাটি সরকারী পুস্তিকা থেকে বাদ দিয়ে করা হয়েছে 'পরিবার উন্নয়ন'। যাদের দাপটে একদিন দেশ ভাগ হয়েছিল তাদের দাপটেই এখনও আমাদের সরকার চলেছে। আমাদের দুর্ভাগ্য। কারণ অপরিণামদর্শী হিন্দু তার স্বার্থবিরোধী কংগ্রেসকেই এখনও ভোট দিয়ে ক্ষমতায় বসায়। চিরনিদ্রায় অভ্যস্ত হিন্দু জনগোষ্ঠী যেন বুঝতে না পারে তারা ক্রমশই হিন্দুস্থানে নগণ্য হয়ে পড়ছে। তাই এবারের রিপোর্টে বাড়তি ১৯ কোটিতে কতজন হিন্দু, আর কতজনই বা মুসলমান ও খৃস্টান বেড়েছে তা দেখানো হয়নি। লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে নারী-পুরুষের অনুপাত নিয়ে বিবাদ; কন্যাভ্রূণ হত্যা নিয়ে পুরুষের সঙ্গে নারীর সম্পর্কে সহমর্মিতা বিনষ্ট ইত্যাদি ইত্যাদি। কংগ্রেস সরকারের আনুকূল্য প্রাপ্ত পত্র-পত্রিকাগুলি এই বিবাদকেই উস্কে দিতে ব্যস্ত। হিন্দু জনগোষ্ঠী চিরকালই রাষ্ট্র সম্পর্কে উদাসীন, তারা একবারও ভেবে দেখে না ভারতীয় সংবিধানে পাকিস্তান সংবিধানের মত সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর জন্য পার্লামেন্টে কোনও সংরক্ষণ নেই। অথচ পার্লামেন্টে মুসলিম জনগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলে এ আইন কিন্তু বদল করা যেতে পারে। সংখ্যাভিত্তিক এই গণতান্ত্রিক কাঠামোয় নিজগোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখাটা অত্যন্ত জরুরি, পৃথিবীর বহু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এই বাস্তবতা বুঝতে না পারায় আজ তারা তালিবান অধ্যুষিত হয়ে পড়েছে। হিন্দুরা ভুলে গেছে কংগ্রেসের তৈরি করা আইন অনুযায়ী ২০০১-এ পার্লামেন্টের সদস্যসংখ্যা জনসংখ্যার ভিত্তিতে ৫৪৩ থেকে বাড়ানোর কথা ছিল। কিন্তু সেই সময় বিজেপি ক্ষমতায় থাকায় তা সম্ভব হয়নি। বাজপেয়ী সরকার ২০০১-এর ফেব্রুয়ারী মাসে National Population Policy, 2000 এবং মে মাসে National Population Commission গঠনের ঘোষণা করে। সেখানেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সংখ্যা বৃদ্ধি করলেই কোনও রাজ্য জেলাতে সাংসদ ও বিধায়কের সংখ্যা বাড়িয়ে দিলে সেটা হবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটনার পুরস্কার। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রয়াসে জনসংখ্যার নিরীখে কোনও গোষ্ঠীকে সাংসদ বাড়ানোর প্রক্রিয়া কখনও চলতে পারে না। বাজপেয়ী সরকার আপাতত মুসলিম খৃস্টান গোষ্ঠীর সংসদ দখলের প্রক্রিয়াকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত আটকাতে পেরেছে, কিন্তু তারপর? বিজেপি যদি ভারতবর্ষের ক্ষমতায় তার আগে যেতে না পারে, সেটা হিন্দুদের পক্ষে ডেকে আনবে এক ভয়ানক পরিণতি। কংগ্রেস তৃণমূল জোটের মেকী পরিবর্তনের মোহ হিন্দুদের ত্যাগ করা উচিত। এই জোট তাদের স্বার্থের অনুকূল নয়, বরং প্রতিকূল।

‘কোরাপসান’ এখন ‘ইরাপসান’ হয়ে সিং-সোনিয়া সরকারের গায়ে ফুটে বের হচ্ছে

শিবাজী গুপ্ত

'Corruption' যেন সিং-সোনিয়া সরকারের সারা গায়ে বসন্তরোগের গুটিকার মতো 'Eruption' অর্থাৎ ফুটে বের হচ্ছে। বনেজঙ্গলে বেড়াতে গেলে জোঁক ঘিরে ধরে। একটা ছাড়াতে গেলে দশটা ছেঁকে ধরে। ২নং ইউ পি এ সরকারেরও সেই দশা। একমুখী বিস্ফোটক-চাপা দিলে যেমন তা সাত মুখে ফেটে বের হয়, এই দো-লম্বরী সিং-সোনিয়া সরকারেরও সেই হাল। জাল জোচ্চুরি, প্রবঞ্চনা, ভয়ভীতি প্রদর্শন ও ঘুষ প্রলোভন দেখিয়ে স্বকৃত অপরাধ ও অপকর্মকে যতই ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করুক না কেন, তা বস্ত্রদ্বারা আগুন চাপা দেবার মতোই হাস্যকর। দাহ্য পদার্থ পেয়ে আগুন আরও লকলকিয়ে ওঠে। একের পর এক আর্থিক কেলেঙ্কারির বেড়াজাল কাটাতে না পেরে প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের যোগদানের অছিলায় বিদেশে কেটে পড়েন, আর তার জুমুরুব্বি ইউ পি এ-র চেয়ারপারসন্ পর্দার অন্তরালে অদৃশ্য থেকে দিগ্বীজয় সিং, অভিষেক সিংজী, কপিল সিবালের মতো তোতাপাখীদের দিয়ে ভোঁতা বিকৃতিদানে অপরাধ ঢাকার চেষ্টা করেন।

কিন্তু দুর্নীতির প্রশ্নে কোর্ট-কাছারীর সক্রিয়তা, সংবাদ মাধ্যমের গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠা এবং সাধারণ মানুষের মনে কংগ্রেস চালিত সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভের সক্রিয় প্রকাশ সরকারকে নাজেহাল করে তোলে। এমন সময় গান্ধীর আদর্শ অনুসারী আন্না হাজারের অনশনে সরকারের ভিত নড়ে ওঠে। সরকারের অপকর্মের ভাগীদার ডি এম কে, এন সি পি এবং সমর্থক লালু-মুলায়ম মায়াবতীর দলও শঙ্কিত হয়ে ওঠে। আর সততার সতী-শিরোমণি টি এম সি-নেত্রী মৌনীবাবা (স্ত্রী) সেজে থাকেন। কিন্তু বিষ্ঠামাখা ব্যক্তির সঙ্গে কোলাকুলি গলাগলি করলে সে বিষ্ঠা যে নিজের গায়েও

দেশে দুর্নীতির গোমুখ ১০নং জনপথের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মুখে একথা শুনে মনে পড়ে কোনও এলাকায় চুরিচামারি বন্ধের জন্য আহূত সভায় এলাকার চোরের সর্দার এসে জানাল যে, চৌর্যাপরাধ দমনে সে সবসময় জনগণের সঙ্গে আছে। কিন্তু তখনও তার কোমরে সিঁদকাঠিটি গোঁজা ছিল!

লাগে—দুর্নীতি ও ভ্রষ্টাচারী সরকারের সঙ্গে ঘর করলে সে পাপের ভাগীদারও যে হতে হয়, সে বোধও কি তিনি হারিয়ে ফেলেছেন? মন্ত্রিসভার গায়ের বিষ্ঠা তার গাত্রস্পর্শে চন্দন হয়ে ওঠে না নিশ্চয়ই।

আন্না হাজারে লোকপাল আইনের দাবীতে অনশনে বসেছিলেন। তাতে জনমনে ব্যাপক সাড়া পড়েছিল। মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্নীতিবৃদ্ধিতে ধৈর্যহারা মানুষ দলে দলে গিয়ে ধর্নার স্থানে হাজির হয়। তার মাঝে অনেক সুযোগসন্ধানী এবং সরকারের আড়কাঠিও ছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল আন্না হাজারের দুর্নীতিবিরোধী অভিযানে জল ঢেলে দেওয়া। সে কাজে তারা কিছুটা সফলও হয়েছে বলা যায়। লোকপাল বিলের খসড়া তৈরি করতে যে ১০ জন সদস্যের কমিটি তৈরি হয়েছে তার পাঁচজনই মন্ত্রী, বাকী পাঁচজন আন্না হাজারের মনোনীত, কিন্তু একজনও বিরোধী সদস্যকে কমিটিতে নেওয়া হয়নি। ফলে যে মন্ত্রিসভা দুর্নীতি ও ভ্রষ্টাচারের অভিযোগে কাঠগড়ায়, তার সদস্যদের নিয়ে গড়া কমিটি দুর্নীতির ফাঁকফোকর বন্ধে কতটুকু আন্তরিক হবে সে প্রশ্ন মানুষের মনে জাগছেই।

তবে এই বিক্ষুব্ধ জনগণকে লোকপাল বিলের মুলো দেখিয়ে অনেকটাই প্রশমিত করে সিং-সোনিয়াদের স্বস্তি দান করেছ তা স্বীকার করতেই হবে। এ ব্যাপারে হাজারে সাহেব তাঁর গুরুরই পথ অনুসরণ করেছেন। তাঁর গুরু গান্ধীও বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ডাক দিয়ে জনমত উত্তাল হয়ে উঠলে, নানা অজুহাতে আন্দোলনের মুখ ঘুরিয়ে দিতেন বা কিছু আশ্বাস পেয়ে একেবারে বন্ধ করে দিতেন। গুরু প্রদর্শিত পথেই আন্না সাহেব যাচ্ছেন না তো!

আন্না হাজারের গুরু গান্ধী যেমন সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতেন, সে সঙ্গে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পত্র চালাচালি করতেন, আন্নাজীও সোনিয়া পরিচালিত সরকারের দুর্নীতি ও ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে চিঠি লেখালেখি শুরু করেছেন এবং সোনিয়াজীও দুর্নীতি-দূরীকরণ প্রশ্নে তাঁর সঙ্গেই আছেন বলে আন্নাজীকে আশ্বস্ত করেছেন। দেশে দুর্নীতির গোমুখ ১০নং জনপথের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মুখে একথা শুনে মনে পড়ে কোনও এলাকায় চুরিচামারি বন্ধের জন্য আহূত সভায় এলাকার চোরের সর্দার এসে জানাল যে, চৌর্যাপরাধ দমনে সে সবসময় জনগণের সঙ্গে আছে। তখনও তার কোমরে সিঁদকাঠিটি গোঁজা ছিল!

এটিপি সার্কিটে ফের স্বমহিমায় লি-হেশ

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

লিয়েন্ডার পেজ, মহেশ ভূপতি নাম দুটি শুনলেই প্রতিটি ভারতবাসীর হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। দেশের জন্য নিবেদিতপ্রাণ দুই আত্মসত্তা যেন স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তা ও চেতনার ঘনীভূত রূপ। স্বামীজি যেমন ভারতবর্ষের প্রাণসঞ্জীবনী আধার, তারই ভাব ও বাণীতো কতটা আত্মস্থ লি-হেশে তা হয়তো প্রশ্ন তুলতে পারে, কিন্তু দেশ ও জাতির জন্য তারাও যে স্বামীজির মতো নিজেদের অনেকটাই উজাড় করে দিয়েছে তা নিয়ে সংশয়ের কোনও অবকাশ নেই। তাইতো দীর্ঘ সাত বছর পর এটিপি সার্কিটে জুটি বেঁধে খেলতে নেমে উঠে আসে তাদের হাত ধরে একের পর এক গৌরবের যতিচিহ্ন। আর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে টেনিসপ্রেমী ভারতীয়রা— কেন যে এঁরা নিজেদের মধ্যে মতান্তর ঘটিয়ে এতদিন বিচ্ছিন্ন ছিলেন। সুসম্পর্কটা বাঁচিয়ে রেখে একসঙ্গে খেললে যে অলিম্পিক পদকও করায়ত্ত হোত।

মাইকেল মধুসূদনের বংশধর লিয়েন্ডার জন্মগত অ্যাথলিট। বাবা ভেস পেজ ছিলেন হকির অলিম্পিয়ান ও বিশিষ্ট ক্রীড়াবিজ্ঞানী। লিয়েন্ডারকে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে বলেছেন যে কোনও খেলা খেললেই লিয়েন্ডার সফল হতেন। তবে শারীরিক গঠন, ফিটনেস, মনের জোর এতটাই উঁচু তারে বাঁধা যে গড়পড়তা ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের থেকে একদম আলাদা লিয়েন্ডার। মা জেপিকার পেজ ছিলেন জাতীয় বাস্কেটবল দলের অধিনায়ক। দীর্ঘদিন অবশ্য তিনি ডাঃ ভেস পেজের সঙ্গে থাকেন না, তবে ছেলে অন্তপ্রাণ জেপিকার। এমন কৃতি ক্রীড়াদম্পতির সন্তান যে বিরাট মানের ক্রীড়াবিদ হবেন তা প্রত্যাশিতই। আর লিয়েন্ডার তার মা-বাবার ক্রীড়াদ্যুতিকে আরও বাড়িয়েছেন নিঃসন্দেহে। তার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে গেছেন ভারতের টেনিস ঐতিহ্যকে।

মহেশ ভূপতি অবশ্য ক্রীড়াপরিবারের সন্তান নন। তাঁর বাবা কৃষ্ণভূপতি ইন্ডিয়ান অয়েল সংস্থার জেনারেল ম্যানেজার ছিলেন। মা সুশিক্ষিত ও সুগৃহিণী। ছেলের স্বাধীন জীবন দর্শনকে লালিত করেছেন বৃহত্তর উদ্দেশ্য পূরণে। মহেশকে কিশোর বয়সে আমেরিকায় পাঠিয়ে উন্নত টেনিস অ্যাকাডেমিতে রেখে তার টেনিস প্রতিভাকে বিকশিত করে দিয়েছেন। তার বাবা বড় চাকুরে ছিলেন কিন্তু শিল্পপতি তো নন। তাই বন্ধু-বান্ধবদের কাছে হাত পেতে টাকা জোগাড় করে আমেরিকার অ্যাকাডেমিতে পাঠিয়েছেন। বেঙ্গালুরুতে স্কুল পর্যায়ে টেনিস খেলে জনৈক টেনিস বিশেষজ্ঞের নজরে পড়ে যান মহেশ। তিনিই কৃষ্ণভূপতিকে প্রস্তাব দেন ছেলেকে বিশ্বমানের খেলোয়াড় করতে হলে আমেরিকায় পাঠাতে হবে। এদেশে যদিও ব্রিটানিয়া-অমৃতরাজ টেনিস অ্যাকাডেমি আছে চেন্নাইয়ে কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। আর ছেলের মধ্যে যেহেতু প্রতিভা আছে তাই কাল বিলম্ব করেননি তাঁরা।

এভাবেই বেড়ে ওঠা দুই টেনিস স্ফুলিঙ্গের। লিয়েন্ডার অবশ্য প্রাথমিক স্কুলিংটুকু করেছেন ব্রিটানিয়া-অমৃতরাজ টেনিস অ্যাকাডেমিতে। তারপর বিদেশে সার্কিটে খেলে একইসঙ্গে প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজেকে গড়েপিঠে নিয়েছেন। দুজনে একসঙ্গে জুটি বাঁধেন ১৯৯৫-এ ডেভিস কাপে। তারপর থেকে টানা ১৬ বছর ডেভিস কাপে ডাবলসে অপরাজিত। প্রতিপক্ষ যত বড় টিম হোক না কেন ডাবলসে কি দেশে কি বিদেশে দুজনকে কোনও জুটি হারাতে পারেননি। এটিপি সার্কিটে ১৯৯৭ থেকে জুটি বেঁধে খেলে এযাবৎ ২৫টি খেতাব জিতেছেন। তারমধ্যে আছে তিনটি গ্রান্ডস্লাম। আর অলিম্পিকে চারবার একসঙ্গে খেলে অবশ্য শূন্য হাতে ফিরতে হয়েছে। এরমধ্যে ২০০৪ এথেন্স অলিম্পিকে পদকের সবচেয়ে কাছে চলে এসেছিলেন লি-হেশ।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের মায়ামিতে মাস্টার্স টুর্নামেন্টে জিতে বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বর আসন ফিরে পেয়েছেন দুজনের জুটি। এই দশকের গোড়ার দিকে তাঁরা দীর্ঘদিন এক নম্বর জুটি ভেঙে দেন ও দেশের সঙ্গে নিজেদেরও সর্বনাশ ডেকে আনেন। এখনও বিদগ্ধ টেনিস প্রশিক্ষক নরেশ কুমার, যিনি দুজনকে হাতের তালুর মতো চেনেন, আক্ষেপ করেন যদি এই জুটিটা না ভাঙতে তাহলে মহামূল্যবান অলিম্পিক সোনা শোভা পেত তাদের ড্রয়িংরুমে। লিয়েন্ডার অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ জিতেছেন। ২০১২-র লন্ডন অলিম্পিক তাদের শেষ সুযোগ এনে দেবে সবেধন নীলমণি অধরা এই পদকটি জিতে নেওয়ার জন্য। তার জন্যই লি-হেশ আবার টেনিস জীবনের শেষপ্রান্তে এসে আত্মোপলব্ধি করেছেন ও এবছরের শুরু থেকে একসঙ্গে খেলছেন। ইতিমধ্যেই একটি গ্রান্ডস্লাম রানার্স খেতাবসহ চারটি এটিপি খেতাব জিতে নিয়েছেন ও একনম্বর স্থানে উঠে এসেছেন। লন্ডন অলিম্পিকই সম্ভবত তাঁদের শেষ স্টেশন।

শব্দরূপ-৫৮০ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

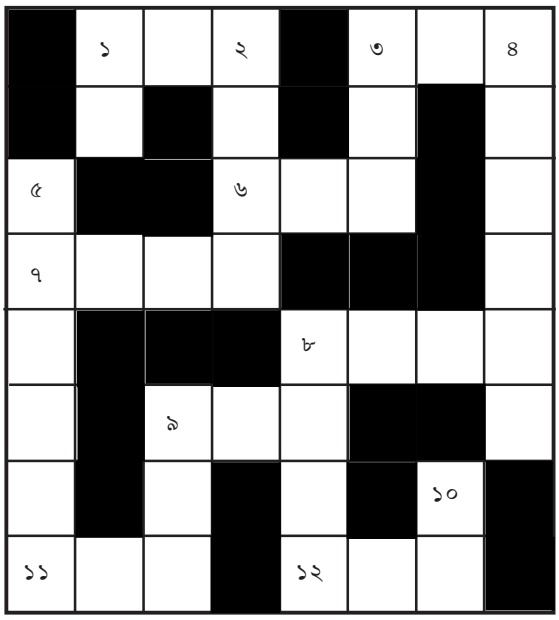

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ১. মহাভারতোক্ত মহানদী বিশেষ, পুরাণে বরুণপত্নী বলিয়া উক্ত, **৩.** 'কিরাতার্জুনীয়' কাব্যরচয়িতা কবি, **৬.** রাজার নিকট পরিচয়ের সহিত যে পেশ্ করে, পেস্কার, **৭.** বিষ্ণু, চন্দ্রবংশীয় রাজা সাঙ্কৃতির পুত্র, **৮.** শত্রুকে যে নিগৃহীত করে, **৯.** কবিকঙ্কন চণ্ডীতে ব্যাধ কালকেতুর পত্নী, **১১.** মিহি, পাতলা, **১২.** কয়েত বেল (বানরের প্রিয় বলিয়া এই নাম)।

উপর-নীচ ঃ ১. পক্ষযুক্ত সুশ্রী দেবযোনি বিশেষ, **২.** শান্তনুতনয় ভীষ্ম, **৩.** শুক্রাচার্য, দক্ষের পুরোহিত, **৪.** কপট সাধু, **৫.** নির্বিকার সমদর্শী যোগসিদ্ধ সন্ন্যাসী, **৮.** প্রলয়কর্তা, মহাদেব, **৯.** কবি কৃত্তিবাসের জন্মস্থান, **১০.** উপাস্য কল্যাণকর।

সমাধান
শব্দরূপ-৫৭৮
সঠিক উত্তরদাতা
শ্যামল বর্মন
সামসি, মালদা
অশোক বসু
নলহাটী, বীরভূম
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

ম	■	জ	লু	স	■	ঋ	■
ক	■	টি	■	গ	বা	ক্ষ	■
র	ঙ্গি	লা	■	র	■	র	■
ধ্ব	■	■	■	■	নি	জা	ম
জ	বা	লা	■	■	■	■	ৎ
■	ল	■	ব	■	ব	য়	স্য
■	খি	ল	কা	■	শি	■	গ
■	ল্য	■	ল	লি	তা	■	ন্ধ্যা

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

● ৫৮০ সংখ্যার সমাধান আগামী ২৩ মে, ২০১১ সংখ্যায়

।। চিত্রকথা ।। সর্প যজ্ঞ ।। ৩

Swastika RNI No. 5257/57
9 May - 2011
Registration No. Kol. RMS/048/2010-2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&PO./SSRM-Kol. RMS/RNP-048/LPWP-028/2010-12

PLEASE VOTE FOR HINDU CANDIDATES WHO ARE HINDU SYMPATHIZERS, ELECT HINDU CANDIDATES IRRESPECTIVE OF PARTY AFFILIATION

The increasing number of Muslim legislators since 1952 indicate a grave conspiracy. In 1952, there were only 6 muslim legislators in the state assembly which stand increased to 45 in the outgoing assembly. In the current assembly election, in 2011, the Left Front has fielded 56 Muslim candidates where as the Trinamool has fielded 42 and the Congress 20 candidates the total number of Muslim candidates being 118.

Hindu votes are being divided into 5 or 6 groups, by these political outfits while the muslim vote en-bloc, and in the process, muslim candidates get elected. One the contrary, if the Hindus vote en-bloc, then the Muslim condidates are sure to be defeated and the Hindu candidates will get elected. Otherwise, what would be the fate of West Bengal which was partitioned on 1947 into two Bengals East Pakistan (that is East Bengal) and West Bengal. Would the keys of Bengal (West Bengal) politics be headed over to the Muslim? To evade this political conspiracy, the Hindus should vote en-masse for the Hindu candidates where the other candidates are Muslim and in the process, the Hindu candidates will be elected. The country was partitioned on communal basis by the then ruling party but even after that partition, a conspiracy has been Ratched to divide the country and the society further. But that conspiracy is to be annulled and the Nationalist Muslim brethren should also come forward to annul the conspiracy.

PLEASE CAST YOUR VOTE FOR THE CAUSE OF THE NATION.

-- Courtsey --

Issued in Public Interest by

FORUM OF NATIONALIST THINKERS
12, Waterloo Street, 2nd Floor, Kolkata - 700 069
Mob. : 9051498919 / 9433047202

দাম : ৫.০০ টাকা